শুকতারা

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

চত্বারিংশৎ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
চৈত্র ১৩৯৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হরিদাস পাল ও সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০ বৎসর পূর্তি বর্ষে

দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীম-কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ

(Chronological Edition)

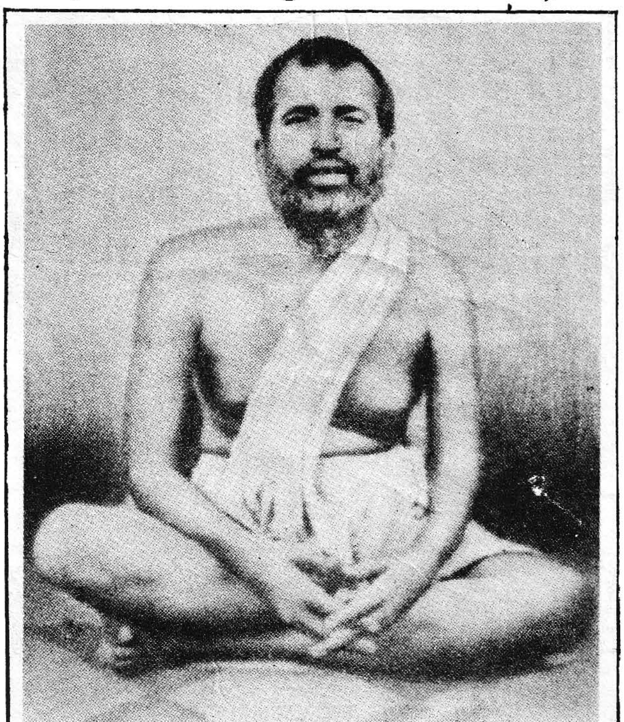

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ ★ ২১, ঝামাপুকুর লেনঃ কলিকাতা–৭০০০০৯

বাঁটুল দি গ্রেট

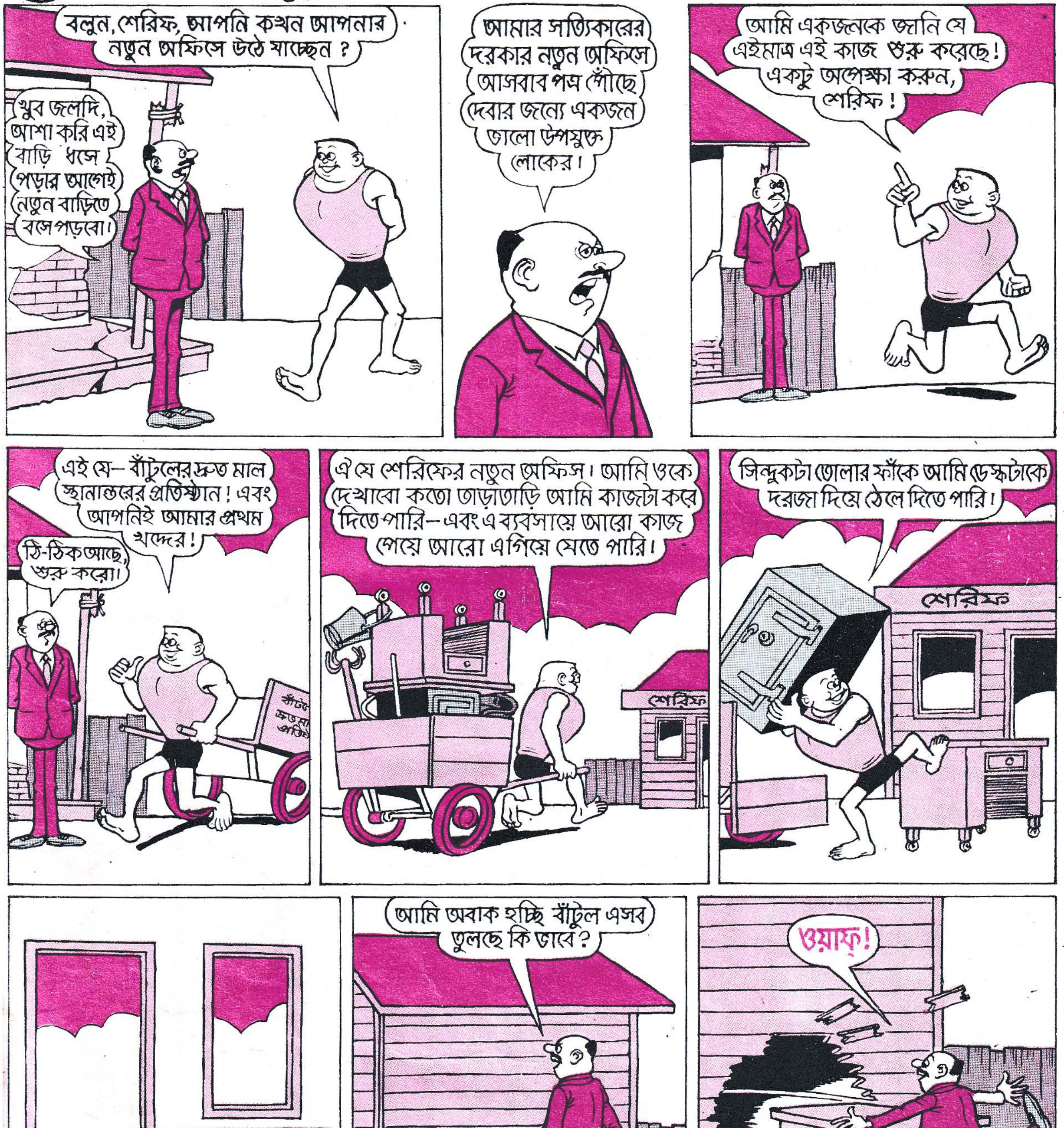

এর পর ৮৪ পৃষ্ঠায়।

আপনার কেয়ো-কার্পিন চুল এই সুন্দর নতুন স্টাইলে বাঁধুন। চমৎকার দেখাবে!

কেয়ো-কার্পিনের এই স্টাইলে কী ভাবে চুল বাঁধবেন দেখুন !

একটি বড় সোনালী রঙের ফিতে নিন। একটি বড় সূঁচে পরান। মাথার সামনে থেকে চুল আঁচড়ে একগুছি চুল মাথার ঠিক উপরে শক্ত করে ধরুন। ফিতে দিয়ে গেরো বাঁধুন। দু'ধারে যেন সমান ফিতে ছাড়া থাকে।

গেরো থেকে এক ইঞ্চি দূরে আবার আধ ইঞ্চি মতন মোটা গুছি চুল নিন। সূঁচটি গুছির চারধারে গোল করে ঘুরিয়ে এনে ফিতের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে টানুন।

উপরোক্তভাবে মাথার দু'ধারে চুলের গুছি "সেলাই" হয়ে গেলে শেষ গুছির কাছে ফিতেটিতে ভালো করে দুটি গেরো বাঁধুন। এবার বাড়তি ফিতে কেটে ফেলুন।

ফিতের ডগা দুটি চুলের ভিতর গুঁজে ভালো করে পিন দিয়ে আটকে দিন।

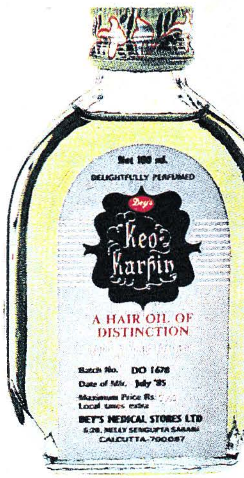

CLARION C-DMHO-11

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং পরিপাটি। অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না। এবার আপনি ইচ্ছেমতো যে কোন স্টাইলে চুল বাঁধুন।

১০০ মি.লি. ও ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল
চুল চটচটে করে না

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

Dey's®

যাদের যত্নই আপনার আস্থা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের
মাসিক পত্রিকা

চৈত্র শুকতারা ১৩৯৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 538 (17) 1 (9) T.B.C. (dated 21.7.86)

সূচীপত্র

১। মৃত্যুদূতের কালোছায়া (ছবিতে গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট (ছবিতে গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ ৮১
৩। ঝুম্পার বায়না (কবিতা) —সন্তোষকুমার অধিকারী ৮৫
৪। বৃশ্চিকের পদক্ষেপ (গোয়েন্দা গল্প রঙিন ছবিতে)—ইন্দ্রনীল ঘোষ ৮৬
৫। শীলভদ্র (অমর বাঙালী) —গৌরী সেন ৮৮

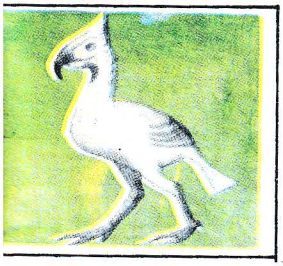

৬। সিকান্দার বেগের প্রতিকৃতি (ভূতের গল্প)—মায়া বসু ৯১
৭। মামদোকে ভূতে ধরেছে (হাসির গল্প) —রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৭
৮। অসাধারণ সব্জীবাগান (কল্পবিজ্ঞানের গল্প) —নিরঞ্জন সিংহ ১০৪
৯। বিশ্বের বিস্ময়—অমল রায় ১০৭
১০। স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প-বিজ্ঞানের গল্প) ১০৮
১১। যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) —সব্যসাচী ১১০
১২। খেলাধূলা— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৫
১৩। ক্রুস লি (ছবিতে গল্প) —ডিভোনো ও ম্যাটেরা ১২৬
১৪। অলৌকিক (সত্য ঘটনা) —নন্দলাল ভট্টাচার্য ১২৮
১৫। পান্ডব গোয়েন্দা (পান্ডবদের নতুন অ্যাডভেঞ্চার) —ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ১৩০
১৬। অঙ্ক জগতের জাদু (ম্যাজিক) —জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ১৩৫
১৭। মকরদ্বীপের রহস্য (ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস)— রাধারমণ রায় ১৩৬

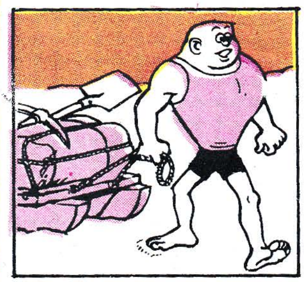

১৮। যে পাখিরা উড়তে পারে না (বিজ্ঞানের গল্প) —নারায়ণ চক্রবর্তী ১৩৯
১৯। পোলাম্যানের স্বপ্ন (ইন্দোনেশিয়ার রূপকথা)—অজিতকুমার দাস ১৪২
২০। চুপ সার্কাস চলছে—২ (হাতে কলমে) —গঙ্গেশ ঘোষ ও মদন মুখোপাপধ্যায় ১৪৫
২১। হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে গল্প)—নারায়ণ দেবনাথ ১৪৬
২২। বিবেক (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) —সুব্রত পন্ডিত ১৪৮
২৩। সবার উপরে মানুষ সত্য (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)—দিবাকর শর্মা ১৪৯
২৪। শিশিরকুমারী চট্টোরাজ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা(ঘোষণা) ১৫০
২৫। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ১৫১
২৬। জিজ্ঞাসার ডাইরি— শিবকৃষ্ণ ১৫৩
২৭। ভূস্বর্গ কাশ্মীর (ভ্রমণ-কাহিনী) —দেবল দেববর্মা ১৫৪
২৮। ছবির মজা—অমল ১৫৬
২৯। দাদুমণির চিঠি ১৫৭
৩০। তোমাদের পাতা ১৫৮
৩১। রবির বার রবিবার (ফিচার) — আরতি বসু ১৬০

র্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ৫৩ টাকা। ডাকে— বুকপোস্টে ৬৫, রেজিস্ট্রি ডাকে ১১১ টাকা। প্রতি সংখ্যা—টাঃ ৪·০০

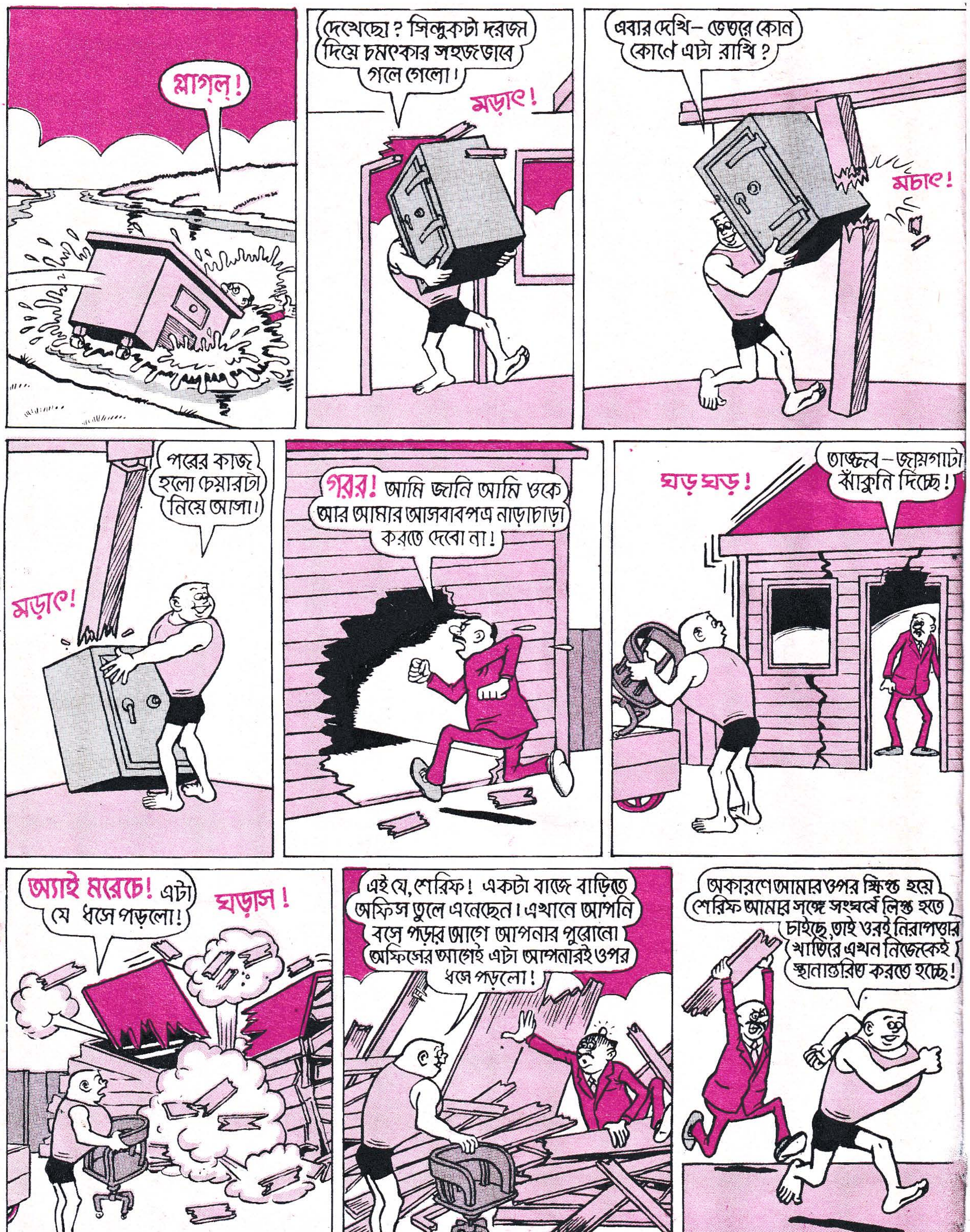
গ্লাগল্!
দেখেছো? সিন্দুকটা দরজা দিয়ে চমৎকার সহজভাবে গলে গেলো।
মড়াৎ!
এবার দেখি– ভেতরে কোন কোণে এটা রাখি?
মচাৎ!
পরের কাজ হলো চেয়ারটা নিয়ে আসা।
মড়াৎ!
গরর! আমি জানি আমি ওকে আর আমার আসবাবপত্র নাড়াচাড়া করতে দেবো না!
ঘড় ঘড়!
তাজ্জব – জায়গাটা ঝাঁকুনি দিচ্ছে!
অ্যাই মরেচে! এটা যে ধসে পড়লো!
ঘড়াস!
এই যে, শেরিফ! একটা বাজে বাড়িতে অফিস তুলে এনেছেন। এখানে আপনি বসে পড়ার আগে আপনার পুরোনো অফিসের আগেই এটা আপনারই ওপর ধসে পড়লো!
অকারণে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে শেরিফ আমার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাইছে, তাই ওরই নিরাপত্তার খাতিরে এখন নিজেকেই স্থানান্তরিত করতে হচ্ছে!

শুকতারা

৪০শ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • চৈত্র, ১৩৯৩/মার্চ ১৯৮৭

ঝুম্পার বায়না

সন্তোষকুমার অধিকারী

ঝুম্পার বায়না–সে দিদানের মতো
শাড়ি পরে রান্নাই করে অবিরত।
নটায় পিসির মতো লিপ্স্টিক্ ঠোঁটে
ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে কলেজেতে ছোটে।
দাদার মতন চাই সিগারেট, পান
দাদুদের সাথে যাবে মোহনবাগান।

ঝুম্পার বড় পিসি গায় শুধু গান
শুনে শুনে হয় তার খাড়া দুই কান।
কাকুর মতন খাতা পেনসিল হাতে
ছবি আঁকা চাই রোজ ঠিক মাঝরাতে।
ব্রিফ্কেস হাতে নিয়ে বাবার মতন
খালি গায়ে ফিয়াটেতে বসেছে কখন।

ঝুম্পা যে বড়, তাই ছোট বোনটায়
বকুনি দিয়েছে খুব কঠিন গলায়।
মাকে এসে বলে,–'ভাত হয়নি এখনো,
আপিসেতে যেতে হবে জ্ঞান নেই কোনো?'
বুকেতে পুতুল শিশু, চোখে ভরা ঘুম
মিছিমিছি তাকে দুধ খাওয়ানোর ধুম।
কোলেতে শুইয়ে তাকে ঘুম পাড়াবেই
মেয়ে না ঘুমোলে তার শান্তি যে নেই।।

ছবি : সরোজ সরকার

হঠাৎ বাতাসে শিস কেটে একটি তপ্ত বুলেট ছুরিটাকে ছিটকে ফেলে দিল।
শা-শা-শা-শা
খট্
আঃ
দু-মুখো টেবিলের গায়ের একটা বোতাম টিপতেই, একটা দেওয়াল, দু-মুখো আর তার দলবলকে আড়াল করে দিল।
আপনাকে তো চিনলাম না।
ধ-ম্-ম্!
আমি কিন্তু তোমাকে জানি,
তুমি বৃশ্চিক! আমি ডি. ডি. ডিপার্টমেন্টের লোক, দুর্বার ত্রিপাঠি।
আসুন ছাত থেকে ওদের দেখা যাবে-
পেছনের দরজায় আবির্ভাব ঘটল এক পিস্তলধারী আগন্তুকে
সবাই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও!
দু-মুখো –
ছাতে যাওয়া যাবেনা। দরজা ওদের দিকে! এদিকে ছাতে দ্বিরথ। জলদি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে সবাই নিচে নাম!
ছাতে –
ঐ যে মিঃ দুর্বার ও গাড়িতে কেটে পড়ছে।
নিচে আমারও গাড়ি রয়েছে, কিন্তু নামতে নামতেই ওরা হাতছাড়া হয়ে যাবে।
অত সহজে নয়! আপনি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকুন···!

সত্যিই আশ্চর্য্য উদ্ভাবন।
এ কার সৃষ্টি বৃশ্চিক ?!
সেকথা এখন নয়।
দু-ম্-ম্!
ক্র-র-র!
প্রচণ্ড গতিতে ত্রিপাঠির গাড়ি এগিয়ে এসে —
— ধাক্কা মারে মালবওয়া গাড়িটাকে।
বৃশ্চিক তুমি দু-মুখোকে দেখ,
আমি অন্যদের সামলাচ্ছি!
ধরেছি!
তুমি আমাকে ধরতে পারবেনা হতচ্ছাড়া ভাঁড়!
আঃ, জেট্ চালু করতে ভুল করায় এটা হল!

শীলভদ্র

গৌরী সেন

রাজসভায় তখন রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। হঠাৎ সান্ত্রী একজন লোককে নিয়ে সভাগৃহে এল রাজা হর্ষশিলাদিত্য অবাক হয়ে চাইলেন। ধূলিধূসরিত ক্লান্ত চেহারা, পরিধানের বস্ত্রটি মলিন, দেহে শুধু উত্তরীয়, উপবীতটি উত্তরীয়ের পাশ দিয়ে কোমর পর্যন্ত লম্বাভাবে ঝুলছে। চোখ দুটি কিন্তু প্রখর এবং উদ্দীপ্ত। লোকটি ঢুকে রাজাকে নমস্কার করতেই রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

লোকটি উত্তর দিলেন, "আমি দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছি, বহু পথ অতিক্রম করে, পাহাড়, নদী পার হয়ে এখানে এসেছি।"

রাজা তখন প্রশ্ন করেন, "আপনার শুভাগমনের কারণ জানতে পারি কি ?"

"মহারাজ, শুনেছি আপনার নালন্দা মহাবিহারে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আছেন অসাধারণ পণ্ডিত।"

রাজা হর্ষশিলাদিত্য বলেন, "ঠিকই শুনেছেন, নালন্দা মহাবিহারে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। তবে ধর্মপালের মতো বিভিন্ন শাস্ত্রে এত পাণ্ডিত্য খুব কম লোকেরই হয়।"

রাজার কথায় দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণের চোখদুটি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মাথা তুলে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, "আমি এত দূর থেকে এসেছি একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই। আপনার নালন্দা মহাবিহারে যে কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে আমি তর্কযুদ্ধে বসতে চাই।"

"ঠিক আছে, আপনি এত দূর থেকে এসেছেন, আপনি আমার অতিথি। আজ আমার অতিথিশালায় বিশ্রাম করুন। আমি নালন্দা মহাবিহারে ধর্মপালের কাছে খবর পাঠাচ্ছি, আগামীকাল যাতে আলোচনা আরম্ভ হয় তার ব্যবস্থা করছি।"

তারপর মন্ত্রীর দিকে ফিরে রাজা বললেন, "মন্ত্রি, তুমি এঁকে আমার অতিথিশালায় নিয়ে যাও এবং এঁর বিশ্রামের সব রকম ব্যবস্থা কর।"

মন্ত্রীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত চলে গেলেন। রাজা হর্ষশিলাদিত্য নালন্দায় ধর্মপালের কাছে লোক পাঠালেন এবং সেই-সঙ্গে বলে পাঠালেন, "ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী এক ব্যক্তি দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছেন আপনার সঙ্গে তর্কযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায়। আপনি প্রসন্ন মনে আসুন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসুন।

ধর্মপালের কাছে খবরটি পৌঁছুতেই সমস্ত নালন্দা মহাবিহারে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মপালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য দণ্ডদেব, পরবর্তী যুগে যাঁর নাম হয়েছিল শীলভদ্র, তিনি এবং ধর্মপালের অন্যান্য শিষ্যরা সবাই ধর্মপালের কাছে এলেন।

দণ্ডদেব বিনীতভাবে বললেন, "আপনাকে কি এখনই যেতে হবে ?"

ধর্মপাল উত্তর দিলেন, "বুদ্ধের নির্বাণপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানসূর্য অস্তমিত হয়েছে। শুধু তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সত্যের একটি আলোক-শিখা শান্তভাবে জ্বলছে। কিন্তু বিরুদ্ধমতবাদীরা পিঁপড়ে আর মৌমাছির মতো একত্রিত হয়ে ঘন মেঘের অন্ধকার সৃষ্টি করছে। সেইজন্য আমাকে এখনই যেতে হবে তাদের একটিকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে।"

দণ্ডদেব বললেন, "তবে আমাকে এই বিরুদ্ধ মতবাদীকে তর্কযুদ্ধ করে পরাস্ত করার অনুমতি দিন। আমি তো এর আগেও বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দিয়েছি।"

ধর্মপালের অন্যান্য শিষ্যরা এত অল্পবয়সী যুবককে তর্ক-যুদ্ধে পাঠাবার কথা চিন্তা করে ভয় পেলেন, কারণ তাঁরা ভাবছেন একজন বর্ষীয়ান পণ্ডিতের সঙ্গে একা তর্কযুদ্ধে দণ্ডদেব কখনই পারবেন না। দণ্ডদেবের বয়স তখন মাত্র তিরিশ।

কিন্তু ধর্মপালের দণ্ডদেবের বুদ্ধিমত্তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। তাই তিনি শিষ্যদের বললেন, "আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমি নিশ্চিত যে দণ্ডদেব বিরুদ্ধ মতবাদীকে পরাজিত করতে একাই একশ'।"

রাজসভাগৃহে তর্কযুদ্ধের আয়োজন করা হলো। ছোট, বড়, দূরের, কাছের, অনেক অনেক লোক ছুটে এল সভাগৃহে, এলেন নালন্দা মহাবিহারের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এই অদ্ভুত তর্কযুদ্ধ দেখার জন্য দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন মতবাদী ব্রাহ্মণ তাঁর মতবাদ ও চিন্তা ধারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা শুরু করলেন, শেষ-পর্যন্ত দুর্বোধ্য যুক্তি-বিচার উপস্থিত করলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত যুক্তি দণ্ডদেবের উপযুক্ত সুদৃঢ় মতামতে,

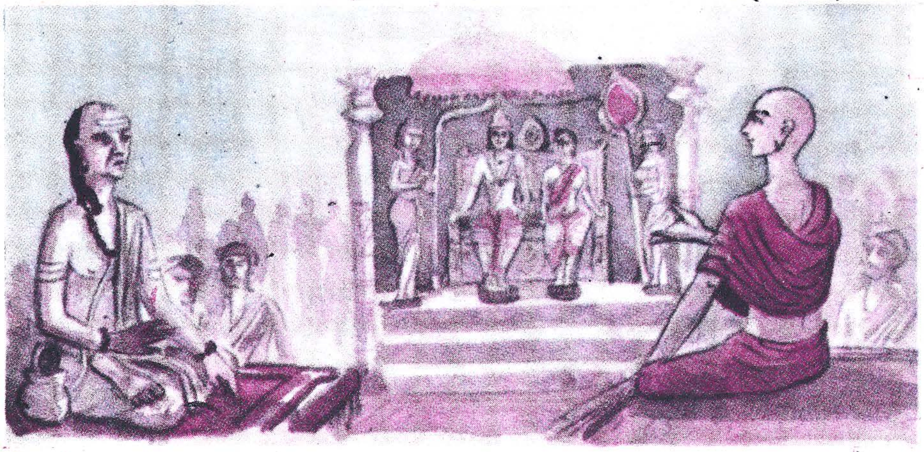

"আমি এসেছি একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই।"

সহজ-সুন্দর বিচারের বাক্-ভঙ্গিমার সামনে ভেসে গেল। দাক্ষিণাত্যের বর্ষীয়ান পন্ডিত শেষপর্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে হার স্বীকার করলেন।

দন্ডদেব জয়ী হলেন। সভায় উপস্থিত পন্ডিতেরা দন্ডদেবের বাক্পটুতায় মুগ্ধ। তাঁর পান্ডিত্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও বিস্তৃত হলো তাঁর পান্ডিত্যের মহিমা।

রাজা দন্ডদেবের এই জয়ে খুব খুশি, তাঁর রাজ্যে এমন জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যিনি অন্য দেশের পন্ডিতকে তর্কযুদ্ধে সহজেই পরাজিত করতে পারেন। তিনি দন্ডদেবকে একটি নগরের রাজস্ব পুরস্কার দিলেন। কিন্তু দন্ডদেব বললেন, "মহারাজ অল্পের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে এবং নিজেকে এতে সৎ রাখা যায়। আমি ভিক্ষুক, সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করব।"

কিন্তু রাজা দন্ডদেবের কোনো যুক্তি শুনতে চান না। তখন তাঁর একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে দন্ডদেব এ পুরস্কার গ্রহণ করলেন এবং ঐ নগরের রাজস্ব দিয়ে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার তৈরি করালেন।

এই সময় থেকেই দন্ডদেব হলেন শীলভদ্র অর্থাৎ যিনি আচার-আচরণে, সততায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

সপ্তম শতাব্দীতে সমতটরাজ্যের রাজার ঘরে শীলভদ্রের জন্ম। সমতট হলো বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ। কুমিল্লা থেকে বার মাইল পশ্চিমে, বড় কামতা গ্রামে—প্রাচীন কার্মান্ত সে যুগে সমতটের রাজধানী ছিল। কিন্তু রাজার ছেলের রাজ-ঐশ্বর্য চাই না, চাই জ্ঞান, আরও জ্ঞান, তাই রাজ্য ত্যাগ করলেন।

অল্পবয়সেই সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছেন বৌদ্ধ-দর্শন ও বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য। তবু জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটে না। শিক্ষার আশায় তিনি নালন্দায় ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষু হলেন। সে সময় ধর্মপাল নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য। অগাধ পান্ডিত্য ছিল তাঁর। অক্লান্ত অধ্যাবসায়ে শীলভদ্র নানা শাস্ত্রে পন্ডিত হয়ে ওঠেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের আঠারটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও আদর্শের সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারতেন; তাছাড়া বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য প্রভৃতি সব বিষয়েই ছিলেন পারদর্শী।

নালন্দা যদিও বৌদ্ধ মহাবিহার কিন্তু সেখানে ধর্ম বা অন্য কোনো ব্যাপারে সংকীর্ণতা ছিল না। এখানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন ছাড়াও বিভিন্ন বেদ, অন্যান্য দর্শন ও নানা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত । ছাত্ররা নিজেদের রুচি ও ভালোলাগা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। তখন সেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

নালন্দা মহাবিহারে একমাত্র শীলভদ্রের সমস্ত বিদ্যায় অপরিসীম জ্ঞান থাকায় শ্রদ্ধায় তাঁর নাম কেউ উচ্চারণ না করে বলত ধর্মনিধি। ধর্মপালের পর শীলভদ্রই নালন্দা মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশ থেকে হুয়েন সাং নালন্দায় আসেন। তাঁকে নালন্দায় সাদর অভ্যর্থনা করা হয়। শোনা যায় দু'শ জন শ্রমণ এবং এক হাজার ছাত্র তাঁকে শোভাযাত্রা করে নালন্দায় নিয়ে আসেন। সংবর্ধনার পর তাঁকে নিয়ে আসা হয় প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা শীলভদ্রের কাছে।

হুয়েন সাং দেখলেন আলোক-উজ্জ্বল সৌম্য বৃদ্ধ শ্রমণ প্রশান্ত হাসি হেসে তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। হুয়েন সাং শীলভদ্রকে দেখে এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি তখনই শ্রদ্ধায় নতজানু হয়ে মহাস্থবির শীলভদ্রের পায়ে মাথা রাখলেন। শীলভদ্র হুয়েন সাংকে আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করতে বললেন। তারপর তাঁকে নালন্দায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হুয়েন সাং বললেন, "আমি সুদূর চীন থেকে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এখানে ছুটে এসেছি আপনার কাছে বৌদ্ধদর্শন

শীলভদ্র হুয়েন সাংকে আশীর্বাদ করলেন।

ও যোগশাস্ত্র শিক্ষা নিতে।"

শিক্ষা শুরু হলো। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, অতুলনীয় দার্শনিক, মনীষী শিক্ষা দিচ্ছেন যাঁকে, তিনি নিজেও পন্ডিত ব্যক্তি, তবু হুয়েন সাং শ্রদ্ধাবনত মস্তকে মহাস্থবিরের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে লাগলেন বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞানবাদ, দর্শন এবং যোগশাস্ত্র।

সে-যুগে আরও একটি সুন্দর প্রথা ছিল নালন্দায়। বছরের শেষে একটি সভা হত প্রায় উৎসবের মতো।

দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা নালন্দায় আসতেন নানা বিষয়ে শিক্ষা নিতে। কিছু কিছু ছাত্র বিদেশ থেকেও আসতেন। কেউ বেদ অধ্যয়ন করতেন, কেউ বৌদ্ধদর্শন, কেউ চিকিৎসাশাস্ত্র। তাঁরা দীর্ঘদিন কঠিন সংযম ও পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সে-সব বিদ্যা আয়ত্ত করতেন। বছরের পর বছর কেটে যেত। তারপর একদিন শিক্ষা শেষ হত। যাঁদের শিক্ষা শেষ হত এই সভায় মহাস্থবির শীলভদ্র তাঁদের আশীর্বাদ করতেন এবং অভিজ্ঞানপত্র দিতেন। কারণ নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা অধ্যয়ন শেষে বিদায় নিচ্ছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

সভার কাজ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ আগেই ছাত্র ও শিক্ষকেরা নিজের নিজের আসন গ্রহণ করতেন, সবশেষে আসতেন মহাস্থবির শীলভদ্র।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিদায়ী ছাত্রদের বলতেন, "আপনাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এবার আপনারা সংসারের পথে যাত্রা করবেন, তবে মনে রাখবেন সংসারের পথ বড় কঠিন এবং বিপদ-সংকুল। আমার কয়েকটি কথা সর্বদা মনে রাখবেন,

"অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিষং দানেন, সচ্চেন অলীকবাদিনং।।

অর্থাৎ ক্ষমা দিয়ে ক্রোধ জয় করবেন, সাধুতা দিয়ে অসাধুকে, কৃপণকে দান করে, আর সত্য দিয়ে মিথ্যবাদীকে জয় করবেন।"

এরপর তিনি প্রত্যেক কৃতী ছাত্রকে অভিজ্ঞানপত্র দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। তিনি বলতেন, "আমরা এ ধরনের অভিজ্ঞানপত্র দেবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের নালন্দায় শিক্ষা লাভ করেছে বলে প্রচার করার ফলে এবং তাদের কার্যকলাপে নালন্দার মর্যাদা ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাই অভিজ্ঞান-পত্রের ব্যবস্থা হয়েছে। এই পত্রে নালন্দা মহাবিহারের বিশেষ সীলমোহর দেওয়া আছে। লক্ষ্য করে দেখুন, আপনাদের অভিজ্ঞান পত্রে আছে একটি ধর্মচক্র ও তার দুপাশে দুটি হরিণ চক্রের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই অভিজ্ঞান পত্রে লেখা আছে 'শ্রীনালন্দা মহাবিহারীআর্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য।' আপনারা নিজেদের নালন্দার ছাত্র হিসাবে পরিচয় দেবার সময় এই অভিজ্ঞানপত্রটি দেখাবেন। আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা নিজেদের কাজে ও ব্যবহারে নালন্দার গৌরব বাড়াতে সবসময় সচেষ্ট থাকবেন।"

আজ বিংশ শতাব্দীতেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের স্বীকৃতি-পত্র দেওয়ার প্রথা আছে এবং তাতে সীলমোহরও থাকে।

দীর্ঘ এত যুগ আগেই নালন্দায় শীলভদ্রের বিচক্ষণ চিন্তাধারা দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। শীলভদ্র দীর্ঘদিন নালন্দায় প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তবে খুবই দুঃখের বিষয় তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থই পাওয়া যায়, গ্রন্থটির নাম 'আর্যবুদ্ধভূমি ব্যাখ্যান'। এ-বইটিও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা।

সে যুগের এই বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধপন্ডিতের কথা আজ ক'জনেই বা আমরা মনে রেখেছি।

ছবি : রাহুল মজুমদার

জানো কী

- লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। কোথা থেকে এলো গৌরী সেনের টাকা?
- পোরিয়া নদীর তীরে সেই ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে সকলে পালাচ্ছেন কেন?
- সূর্য যেদিন নিভে যাবে—সেদিন কি হবে?
- বাঁশবনে চার অপদেবতা কি করছিলেন?
- ভয়ংকর সেই বাঘের ছাল শেষ পর্যন্ত কার কাছে পয়মন্ত হয়ে উঠেছিলো?
- লেখাপড়া মনে রাখতে হয় কি করে?

এ সব ছাড়াও শুকতারার জমজমাট বিশেষ বৈশাখ সংখ্যায় পাবে দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, নাম করা লেখকদের গল্প, নানারকম ফিচার, খেলার আর খেলোয়াড়দের ছবিতে ভরা খেলার কথা, অনেকগুলি কমিকস, আরও কতো কী! বৈশাখ সংখ্যা হাতে পেলে ছাড়তেই চাইবে না। স্টলে আর হকার-বন্ধুদের এখনই বলে রাখো।

সিকান্দার বেগের প্রতিকৃতি

মায়া বসু

ট্রেনটা ছোট বড় পাহাড় আর ঘনসন্নিবিষ্ট কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, দেবদারু আর শাল বনে ঘেরা অজ্ঞাত জঙ্গুলে জায়গাটায় অনিলকে নামিয়ে দিয়ে দুমিনিটও দাঁড়াল না। পড়ন্ত রোদের শেষ আলো তখন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় গড়িয়ে পড়ছে।

ছোট্ট প্লাটফর্মটায় মাত্র দুচারটে দেহাতীলোক সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে শ্মশানযাত্রীর মতো মুখ করে বসেছিল। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। সদ্য জ্বলে ওঠা টিমটিমে আলোগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, একটু জোরে হাওয়া বইলেই ওদের অস্তিত্ব একেবারে মুছে যাবে।

এমন জায়গায় শখ করে মানুষ বেড়াতে আসে!

জায়গাটার চারদিক তাকিয়ে দেখে হতাশ হয়ে গেল অনিল। কলকাতা থেকে অতনুর আকস্মিক অন্তর্ধান। তার কয়েকদিন পরই তাকে একখানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে এখানে টেনে আনার কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে মনে মনে ও খুব বিরক্ত হয়েই ছিল। অতনু তো জানে অনিল বড় একটা কোথাও

যায় না। ওর তো অনিলকে নিতে আসাও উচিত ছিল।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে গেট পেরিয়ে ও সোজা একটা রিকশায় উঠে বসে বলল, মণিকুঠিতে নিয়ে চল। রিকশাওয়ালা একবার ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। তারপর কোনো কথা না বলে আঁকাবাঁকা জংলী পথ ধরে চলতে শুরু করল।

মণিকুঠির কাছে এসে রিকশা থামতেই, বাড়িটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল অনিল। কী সর্বনাশ? ঘন জঙ্গলের ভেতর এই ভাঙাচোরা পোড়ো বাড়িটার মধ্যে অতনু কী করতে এসেছে! আর্টিস্ট মানুষ। ছবি আঁকার বাতিক আছে। কিন্তু সেজন্যে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ এই পান্ডববর্জিত জায়গায়, জনহীন এমন একটা জীর্ণ বাড়িতে ও কী করতে এসেছে? আর অনিলকেই বা এমন ভাবে টেলিগ্রাম করে টেনে আনল কেন?

রিকশা ভাড়া মিটিয়ে অনিল বাড়ির ভেতর ঢুকল। কোথাও কেউ নেই। চেঁচিয়ে ডাকল, অতনু, এই অতনু? তুই কোথায়?

এসে গেছিস? যাক বাঁচলাম। আয় এ ঘরে আয়। অতনু তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে খুশিভরা গলায় ওকে অভ্যর্থনা জানাল।

সাবধানে উঠোনের জঙ্গল পেরিয়ে ভাঙ্গা বারান্দার ওপর উঠে অনিল অতনুর পেছন পেছন সামনের ঘরে ঢুকল। ঘরটা হলঘরের মতো বড়। চেহারা, পলেস্তারা খসা বাইরের মতোই—চুন বালি খসা। ফাটা মেঝে। সারা ঘরময় কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। হলের দুদিকে দুখানা তক্তাপোশ। তার ওপর তোশক চাদর বালিশ। একপাশে জামাকাপড় রাখার আলনা। জলের কুঁজো গ্লাস, টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর খানকতক বই, সেভিং সেট, আয়না চিরুনি, এটা সেটা টুকটাক জিনিসপত্র।

রাস্তার দিকের জানলার কাছে অতনুর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। রং তুলি, ক্যানভাস ইজেল ইত্যাদি। আরো কিছু কিছু জিনিসপত্র অগোছালো ভাবে এদিক ওদিক ছড়ানো।

হাতের ব্যাগদুটো একপাশে রেখে, হলের চারদিকে তাকিয়ে ব্যাজার মুখে অনিল বলল, যেমন বাড়ির ছিরি, তেমনই ঘরের চেহারা।

এটা আমার পিসিমার বাড়ি। বেওয়ারিশ পড়েছিল। তাই এখানে এসে উঠেছি। আর এখানে কেন এলাম? সব বলব। তোকে টেলিগ্রাম করে এমনই আনিনি। আগে ট্রেনের জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। বারান্দায় বাথরুমে জল তোলা আছে। বিরজু বাজারে গেছে।

বিরজু দেহাতী হলেও, ভালই রান্না জানে। বাংলাও জানে। বাজার থেকে ফিরে এসেই ও চা খাওয়ালো ওদের। তার পর রাত আটটা বাজতে না বাজতেই আবার ওদের মাংসের ঝোল গরম ভাত আলু ভাতে ঘি সব কিছু যত্ন করে খাইয়ে, টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে ঘরে ফেরার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অতনুর সামনে এসে দাঁড়ালো।

অতনু অনুনয় করে বলল, কী বিরজু আজও বাড়ি যাবে?

বিরজু মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল, না দাদাবাবু, আমি থাকব নাই। কাল সকালেই আসব। চা খাবার করি দিব।

তবে যাও। মশারি দুটো ভাল করে ফেলে রেখে যেও। অতনু যেন রাগ করেই অন্য দিকে চলে গেল।

অবাক অনিল বলল, সে কি বিরজু, তুমি রাত্রে এ বাড়িতে থাক না? অতনু একাই থাকে!

বিরজু চাপা গলায় বলল, দাদাবাবু, আগে আমি আমার পরিবার, আমরা তো বরাবরই থাকতাম এ বাড়িতে। কিন্তু বড়দাদাবাবু আসার পর আর থাকতে পারলাম নাই।

থাকতে পারলে না! কেন?

সে আমি কিছু বলবেক নাই। রাত্তিরেই মালুম হবে। তারপর আরও গলা নামিয়ে বলল, শুনুন ছোটদাদাবাবু, যদি ভাল চান তো কাল সকালেই বড়দাদাবাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

অনিল বিরজুর চোখেমুখে এক অপরিসীম আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেয়ে কিছুটা আন্দাজ করে বলল, কেন? এই পোড়ো বাড়িটা বুঝি ভূতের বাড়ি?

না না দাদাবাবু। বাড়িটা ভাঙ্গাচোরা, জঙ্গলের মধ্যে হলেও আমি তো ইখানে পরিবারকে নিয়ে অনেক বছর আছি। কিন্তক, ...ওই দাদাবাবু আসছে। আমি যাই।

বিরজু চলে যাবার পরই অতনু ফিরে এলো। অনিলের চিন্তিত গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী রে? চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেন? বিরজু বুঝি তোর কানে মন্তোর পড়ে গেল? চল, ঘরের ভেতর চল। বাইরে যা ঠান্ডা!

ঘরে ঢুকেই অতনু দরজায় খিল তুলে দিল। একটা জানলা খোলা ছিল। বাইরে থেকে উত্তরে হাওয়া এসে জ্বলন্ত লণ্ঠনটার পলতেটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, ফলে কালিপড়া কাঁচের চিমনির ভেতর ম্লান আলোটা দপ্‌দপ্ করছিল। স্থির চোখে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে অতনু বলল, জানলাটা বন্ধ করে দিই কী বলিস?

অনিলের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই অতনু জানলাটা বন্ধ করে টেবিলের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

ফেব্রুয়ারির শেষ। শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। অনিল বিছানার মধ্যে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে বসে প্রশ্ন করল, এবার সোজা সত্যি কথাটা বল দেখি বাপু? এই জঙ্গলের মধ্যে তুমি শখের ছবি আঁকতে এসেছো, বেশ করেছো। কিন্তু আমাকে টেলিগ্রাম করে এমন ভাবে এখানে টেনে আনলে কেন?

অতনু টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই টেনে নিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, অনিলকেও একটা ধরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হাসল। হাসিটা খুব ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ মনে হলো অনিলের।

কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন। অনিল ধোঁয়া উড়িয়ে আবার তাগাদা মারল।

কাল শুনিস। আজ সারাদিন ট্রেনের ধকল গেছে। কাল সকালে বলব। তবে বলবার মতও তেমন কিছু ঘটেনি—

যেটুকু ঘটেছে, তাই বল। এখনি শুনব।

যদি বলি, একা থাকতে ভাল লাগছিল না?

বিশ্বাস করব না।

অতনু কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, প্লীজ, কাল সব শুনিস।

চেয়ার ছেড়ে উঠে অতনু লণ্ঠনটা ঘরের কোণে সরিয়ে রাখল। তারপর মশারি ফেলে নিজের বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত এখন নটাও বাজেনি।

পোড়ো বাড়িটার চারপাশের বুনো গাছ-গাছালির জঙ্গল থেকে তক্ষক ডাকছিল। ঝিঁঝির বিচিত্র ঐকতান ভেসে আসছিল। বাতাসে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি উঠছিল। আর থেকে থেকে শেয়াল খটাসের ছুটোছুটির শব্দ উঠছিল। এসব শব্দই অন্ধকার রাতে স্নায়ু শিথিল করা, শরীর মন হিম করে দেওয়া নিস্তব্ধতা অনিল আগে কখনো অনুভব করেনি।

অতনুর মেজাজ ভাল নেই। কথা বলার মুডও নেই।

কিন্তু কেন নেই? এ কথা বুঝতে পারল না অনিল। এক অদম্য কৌতূহল নিয়েই ওকে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ কথা ভেবে ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

অতনু রায়। নামকরা চিত্রশিল্পী। বহু নামী আর্ট গ্যালারিতে বহুবার ওর একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। কিছু দিন ধরে এক নতুন পদ্ধতিতে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক কালের চিত্রশিল্পীদের মাঝে অতনুর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা, অনেক নামী আর্টিস্টেরই ঈর্ষার কারণ।

বিশেষ করে পোর্ট্রেটে অতনুর হাত অপূর্ব। দেশবিখ্যাত কয়েকজনের প্রতিকৃতি এঁকে ও পুরস্কারও পেয়েছে।

নতুন জায়গা অচেনা পরিবেশ, একটা অস্বস্তি তো থাকেই। বিছানাটাও অনিলের মনোমত নয়। তার ওপর দারুণ ঠান্ডা। ঘুম আসছিল না ওর।

লণ্ঠনটা দরজার পাশে ভূষোকালি মেখে মিট মিট করে জ্বলছিল। তাতে ঘরের মাঝে আলোর থেকেও গা ছমছমে অন্ধকারই যেন বেশি। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল অনিল। ঘুম আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছিল অতনুকে ডাকে।

কিন্তু অতনু সেই যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে আর ওর কোনো সাড়া নেই। সত্যিই ওর শরীর ভাল নেই, মাথা ধরেছে কি না, কে জানে? নানা চিন্তা করতে করতে নিজের অজান্তেই অনিল ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ কেটে গেছে, কটা বাজে কে জানে? হঠাৎ একটা খস্‌খসানির শব্দে অনিলের ঘুম ভেঙে গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই ও টের পেল, হলের ভেতরেই কে যেন অস্থির

প্রথম দুটো রাত বাদে কদিন একেবারেই ঘুমোতে পারিনি

পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সশব্দে চোর ঘুরে বেড়ায় না। তা হলে কে? ও কে ? বিমূঢ় অনিল চিৎকার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে একটা শব্দও বার হলো না।

সাহস করে চোখ খুলে শব্দের উৎসস্থলের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। লণ্ঠনটা কখন নিভে গেছে কে জানে?

মাত্র কয়েক হাত দূরে অতনু শুয়ে আছে। সে কি এই শব্দ শুনতে পাচ্ছে না? অনিলের ইচ্ছে হলো বিছানা থেকে নেমে ওকে ধাক্কা দিয়ে টেনে তোলে। কিন্তু তাও সম্ভব হলো না। কেন না ভয়ে ওর হাত পা ঠান্ডা অবশ হয়ে গেছে।

অনিল আবার অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে সেই শব্দের দিকে তাকাল। এবার মনে হলো, যেন একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার চলন্ত মূর্তির রূপ ধরে ঠিক অতনুর ক্যানভাসের আশেপাশে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ সেই চলন্ত মূর্তিটা থমকে দাঁড়াল। তার একখানা হাত শূন্যে উঠল, যেন ও কাউকে ভীষণভাবে আঘাত করবে। যেন ও খুন করতেই চায়। অন্ধকার চোখে সয়ে যাওয়ায় অনিল তার হাতে একটা অস্ত্রও দেখতে পেল। ছুরি বা ভোজালি। হাত

নামল। পর মুহূর্তেই ফ্যাঁস করে একটা বিশ্রী আওয়াজ উঠল।

অতনুর বিছানা থেকে সেই মুহূর্তেই জোরালো টর্চের আলো সেই ছায়ামূর্তিটার ওপর পড়ল। বিস্ফারিত চোখে অনিল দেখল, এক ক্রূর হিংস্র মুখ। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সেই ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

অনিলের মুখ দিয়ে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

ততক্ষণে অতনু বিছানা ছেড়ে নেমে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে আলোয় অনিলও যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল।

লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে অতনু ইজেলটার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল। সেই দিকে তাকিয়ে অনিলও থমকে গেল। অতনু হয় কাল সারাটা দিন ধরে যে পোর্ট্রেটটা এঁকেছিল, কারও অদৃশ্য নিষ্ঠুর হাত ছুরির আঘাতে সেই ছবিখানাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে রেখে গেছে।

অতনু এ কী ব্যাপার? ঘরে কে এসেছিল! অনিলের কণ্ঠস্বর ভয়ে আড়ষ্ট।

অতনু ছেঁড়া ছবিখানার ওপর একখানা তোয়ালে চাপা দিয়ে নিজের বিছানায় এসে বসল। তার মুখ রক্তহীন। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। মুখ ফিরিয়ে মশারির বাইরে বসে থাকা অনিলের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, এই জন্যেই...অনিল তোকে এখানে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিলাম। মন প্রাণ দিয়ে এই পোর্ট্রেটটা নিরিবিলিতে বসে আঁকব বলেই এই জঙ্গলে পোড়োবাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই পারছি না...পারছি না...

ছবি আঁকার জন্যে কলকাতা ছেড়ে এই জঙ্গলে এসেছিস! কেন, এ কাজ তো তোর স্টুডিওতেই করতে পারতিস।

আমি যে ছবি আঁকছি, সেটা ওখানে বসে আঁকা সম্ভব হতো না। ক্লান্ত ভাবে ও বলল।

লণ্ঠনটার আলোয় ঘর কিছুটা আলোকিত। অনিলের সাহস ক্রমে ফিরে আসছিল। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ও আবার সেই প্রশ্ন করল, কিন্তু অতনু, দরজা তো বন্ধই আছে। তাহলে হলের ভেতর কে এসেছিল?

অতনু দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করেই রইল।

অতনু, এটা এমনই একটা ব্যাপার যা আমি বুঝতে পারছি না। অথচ তুইও মুখ বন্ধ করে আছিস। তবে কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না, এই পোড়ো বাড়িতে তেমনই কিছু একটা আছে?

অতনু মুখ থেকে হাত সরিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় জবাব দিল, অনিল, রাত দুটো বেজে গেছে। তুই বিশ্বাস কর, এখানে আমি মাত্র ছদিন এসেছি। দিন চারপাঁচ পোর্ট্রেটটা আঁকতে শুরু করেছি। কিন্তু প্রথম দুটো রাত ছাড়া বাদ বাকি ক'দিন একেবারেই ঘুমোতে পারিনি। কাল সকালে তোকে সব দেখাব, সব কিছু খুলে বলব।

পরদিন বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠল অনিল। চারদিকে দিনের আলো। রাস্তায় লোকজনের আসাযাওয়া। বিরজু আর তার বৌয়ের উপস্থিতিতে অনিলের মন থেকে রাত্রের বিভীষিকা ক্রমে আবছা হয়ে গেল। বাড়িটাকেও বেশ ভাল লাগল। পুরোনো ভাঙাচোরা হলেও বেশ খোলা মেলা। ভেতরটা পরিষ্কার। উঠোনে বিরজু আর তার বৌয়ের যত্ন ও পরিশ্রমে ফুলের গাছ, সব্জীর বাগান তৈরি হয়েছে। কয়েকটা পেয়ারা আর আতা গাছও আছে এক দিকে।

বারান্দা থেকে ছোট বড় ঢেউ তোলা পাহাড় দেখা যায়। ভোরবেলা তার মাথায় প্রকাণ্ড সোনার থালার মতো সূর্য উদয় হয়। সামনে যতদূর চোখ যায়, সতেজ সবুজ ছোট বড় গাছ-গাছালি। গাছের আড়ালে একটা ছোট্ট রূপোলী নদী।

বিরজুর বৌ ঘরের সব কাজ শুরু করলো। বিরজু ওদের চা টোস্ট দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শশা, কলা, গরম দুধ এনে দিল। খেতে খেতে অতনুকে লক্ষ্য করছিল অনিল। এত ভাল খাওয়াদাওয়া, এত স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকা, তবু ওর চোখের কোণে কালি, শরীর দুর্বল রুগ্ন!

বিরজু বাজার থেকে মাছ আনবার জন্যে টাকা নিয়ে বেরিয়ে যেতে অতনু অনিলকে সঙ্গে নিয়ে হল ঘরে ঢুকল। ক্যানভাসের ওপরকার তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলতেই, কোনো অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে ছেঁড়া গত রাতের সেই ছবিটা দিনের আলোয় ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অনিল অতনুর মুখের দিকে তাকাতেই ও নিঃশব্দে পাশের পুরোনো টেবিলটার ওপর থেকে একখানা ছবি তুলে অনিলকে দেখতে দিল।

ছবিটার দিকে তাকিয়েই অনিলের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। কোনো একজনের এনলার্জ করা প্রোফাইল। কিন্তু এমন কুটিল ক্রূর নিষ্ঠুর মুখ অনিল আগে কখনো দেখেনি। অতনুর আঁকা অনেক খুনী ডাকাত, ঘাতকের ছবি ও দেখেছে কিন্তু এমনটা আর কোনোটা নয়। ছবিটা এতই প্রাণবন্ত, দেখলেই মনে হয় যেন এখনি কথা বলে উঠবে।

কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে অনিলের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সোজাসুজি অতনুর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, এটা সেই...সেই লোকটার ছবিটা না?

হ্যাঁ, আমি এই ছবিটা আঁকব বলেই এখানে চলে এসেছি।

অনিলের মনে ভেসে উঠল কিছুদিন আগেকার সেই ঘটনাটা। একটা পুরোনো বাড়ির হলঘর, দেয়ালে নতুন পুরোনো নানা ধরনের ছবি টাঙানো। বেশির ভাগই তার পোর্ট্রেট। পাগড়ি পরা, টুপিফেজ, মুকুট পরা, সগুম্ফ কীর্তিমান পুরুষ থেকে শুরু করে, অতি সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি। ছোট বড় নানা রকম তৈলচিত্র। জমিদার, নবাব, সাঁওতাল দম্পতি—কেউ বাদ নেই তার মধ্যে।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনিলের বিশেষ কোনো জ্ঞানই

ছিল না। তবুও অতনুর সঙ্গে ওকে যেতে হয়েছিল।

ছবিগুলো খুব মনোযোগ দিয়েই দেখছিল অতনু। ছবিগুলো দেখা শেষ করে চলে আসবার সময়ই হঠাৎ এক কোণে অবহেলা উপেক্ষায় টাঙিয়ে রাখা বিবর্ণ একখানা ছবির দিকে নজর পড়েছিল অতনুর। ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে অনিলও থমকে দাঁড়িয়েছিল। তাকিয়ে দেখেছিল সেই ছবিটা। বিকৃত কুৎসিত কুদর্শন একটা মুখের ছবি। অতনুর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সম্মোহিতের মতো অপলক চোখে ও সেই ছবিটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

একটু পরেই অতনু সেখান থেকে সরে গিয়ে প্রদর্শনীর এক কর্মকর্তার সঙ্গে কি সব বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল। সেসব কথার মধ্যে প্রথমে অনুনয় বিনয় পরে তর্কাতর্কিও ছিল। অনিল বিরক্ত বিব্রত হয়ে অতনুকে ওখান থেকে একরকম জোর করেই টেনে বার করে নিয়ে এসেছিল।

বাড়িতে ফিরে অতনু ছবিটার কথা খুলে বলেছিল। হিংস্র নিষ্ঠুর দর্শন মুখের ছবিটা সিকান্দার বেগের। সিরাজউদ্দৌলাকে যে বন্দী অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল, এই লোকটা সেই মহম্মদী বেগের একমাত্র বংশধর।

সিকান্দার বেগও নৃশংস চরিত্রের মানুষ।

একবার কোনো এক চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ওর খুব শখ হয় নিজের ছবি আঁকাবার। সেই শখের ফল বড়ই ভয়ংকর হয়েছিল। ছবি শেষ হয়ে যাবার পর সিকান্দার বেগ তার ছবি দেখে এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে সেই চিত্রকরকে হত্যা করেছিল। সেই ছবিখানা নষ্ট করার আগেই সিকান্দার বেগ নিজেও খুন হয়ে যায়। কে যে তাকে খুন করেছিল তা জানা যায়নি।

সেই ছবিখানাই এত বছর বাদে বিবর্ণ হয়ে, অনেক হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত এই এগজিবিশনে এসে পৌঁছেছে।

ছবিটা দেখার পর থেকেই সেটাকে নতুন করে আঁকবার একটা ভয়ংকর ইচ্ছা অতনুর মনে। কর্মকর্তার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে ছবিটা কিনতেও চেয়েছিল অতনু। প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি। তখন অতনু তাঁকে একটা মোটা অংকের টাকা দিয়ে দিন পাঁচ সাতের জন্যে ছবিটাকে ভাড়া করতে চেয়েছিল নিজে আঁকবার জন্যে। কিন্তু তার এ প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ নাকচ হয়ে যায়। ভদ্রলোক কেন যে এমন করলেন সে বিষয়ে ওকে কিছু বলেননি।

পৃথিবীতে এত সুন্দর বিষয়বস্তু, এত জ্ঞানীগুণী মানুষ থাকতে অতনু যে কেন ওই খুনে লোকটার ছবিটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল, কে জানে? একেই বলে বাতিক।

সেই অলুক্ষণে ছবিটাই আজ এখানে!

অনিল এবার প্রশ্ন করল, ছবিটা তুই কেমন করে পেলি?

আমি ওটা চুরি করেছি। কেমন করে চুরি করেছি নাইবা শুনলি। তারপরই সোজা এখানে পালিয়ে এসেছি। কলকাতায় থাকলে পাছে ধরা পড়ি।

তুই ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছিস তাই।

ভেবেছিলাম ছবিটার ডিটেল ওয়ার্কগুলো শেষ করে ওটা আবার যথাস্থানে রেখে আসবো। কিন্তু তুই শুনলে অবাক হবি ছবিটা দিনের বেলা আঁকছি আর রাত্রে রোজ এসে কে ওটাকে ছিঁড়ে নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে! আজ বুঝেছি কে অমন করে ছবিটা নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছিল!

অবাক অনিল বলল, কাল রাতে কে এসেছিল ঘরে?

সিকান্দার বেগের আত্মা!

অনিলের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অতনুর হাত ধরে ও অনুরোধ করল, অতনু, প্লীজ, তুই ওই ছবি আঁকা বন্ধ কর।

এত সহজে অতনু রায় হার মানবে না। অতনু উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি বুঝেছি, যে আর্টিস্ট সিকান্দার বেগের ওই পোর্ট্রেটটা এঁকে ছিলেন তিনি ওর স্বভাব চরিত্র ওর প্রকৃতি যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আমি পারব। ওর রক্তলোলুপ খুনী স্বভাব আমি ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটিয়ে তুলবই।

না অতনু না। তোকে আমি একাজ করতে দেব না। তুই তো জানিস, যিনি ওর ওই পোর্ট্রেটটা এঁকেছিলেন, তাঁর কি দশা হয়েছিল।

হাসল অতনু, একজন জীবন্ত মানুষ যা করতে পারে, অশরীরীর পক্ষে তা করা একেবারেই অসম্ভব। আমার কাজ

পন্ড করে ও আমাকে বারে বারে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ও অতনু রায়কে চেনে না। ওর ছবি আমি আঁকবই। শুধু তুই, যদি মাত্র দু তিনটে দিন আমার কাছে থাকিস।

সারাটা দিন অতনু তার ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। অনেকটা কাজ এগিয়েও গেল। অনিল আসার পর থেকেই ওর মনটা ভাল, তাই বেশ দ্রুত গতিতেই প্রাথমিক কাজগুলো শেষ হলো। সারাটা দিন একটানা কাজ করে ও যখন উঠল, তখন ক্যানভাসের বুকে সিকান্দার বেগের চেহারার আদল স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো জ্বলন্ত। মুখের রেখায়, নাকের পাশের ভাঁজে ভাঁজে ভুরুর ভঙ্গিতে আর পুরু ঠোঁটের কুটিলতায় এমনই একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠল যে বেশিক্ষণ আর ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

অন্য ক'দিনের মতো বিরজু নটা বাজতে না বাজতেই ওদের রাতের খানা খাইয়ে বাড়ি চলে গেল। দরজা জানলা বন্ধ করে শুতে যাবার আগে সদ্য আঁকা ছবিখানা ইজেল থেকে খুলে অতনু অনিলের বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। অনিল অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হেসে বলল, তোর ওপর তো সিকান্দার বেগের রাগ নেই। তোকে তাই সন্দেহই করবে না। তাই এখানে রাখলাম।

কিন্তু ও যদি আসল ছবিখানা নষ্ট করে দেয়? তাহলে?

তা কখনো করবে না। কদিন ধরেই দেখছি তো। নিজের আসল ছবিখানা যেমনই হোক, ও সেটা স্পর্শও করে না।

ভীষণ ভয়েই অনিল কি যেন বলতে গেল.....তাকে থামিয়ে অতনু বলল, তোর কোনো ভয় নেই। যতই হোক ও তো রক্তমাংসের কোনো জীব নয়। একটা অশরীরী ছায়া মাত্র।

অনিল কাঁপা গলায় বলল, ফালাফালা করে যে ছবিটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তাকে কি ঠিক ছায়া শরীর বলা যায় অতনু?

সেদিন রাত্রেও সেই অশরীরীর উপস্থিতি টের পেল ওরা। টের পেল, সে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী যেন খুঁজছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। দুজনে মড়ার মতো কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর বোধহয় ব্যর্থ হয়েই সেই প্রেতাত্মা হল-ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

ওরা দুজনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। আনন্দে অধীর হয়ে অতনু বলল, দেখলি তো, যা বলেছিলাম। বোধহয় ও আর আমাদের জ্বালাবে না।

অনিল বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, ওসব জানি না। তোকে কিন্তু আমি আর মাত্র দুটো দিন সময় দিচ্ছি।

তারপর দু'দিন দু'রাত কেটে গেছে। এই দু'রাতেই সিকান্দার বেগের প্রেতাত্মা এসে এদিক ওদিক হাতড়ে গেছে।

আজকের রাতটাই ওদের শেষ রাত। কদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অতনু সিকান্দার বেগের যে ছবি ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তুলেছে সত্যি বলতে কি, সেই ছবির দিকে তাকিয়ে অনিল খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। অতনু দারুণ উল্লসিত। কোন দেশের কোন চিত্রশিল্পী, কোন কোন খুনী ঘাতক জল্লাদের ছবি এঁকেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ অনিলকে শুনিয়ে দিল।

শোবার আগে অতনু সযত্নে ছবিখানা নিজের বিছানার মাথার কাছে রাখল। অবাক অনিল জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী, ছবিটা আজ তোর বিছানার কাছে রাখছিস কেন?

তুই যে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিস, তাই।

অতনুর কথায় অনিল স্বস্তি পেল। সত্যিই ছবিটার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।

রাতের প্রথম প্রহর বেশ শান্তিতেই কাটল। রাত বাড়ার সংগে সংগে চারদিক ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে এল।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ শব্দে অনিলের ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল, লণ্ঠনটা নিভে গেছে। ঘর অন্ধকার। দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দের সংগে একটা ঝাপ্‌টাঝাপটির শব্দও ওর কানে এসে পৌঁছল।

'অতনু...অতনু...' অনিল চিৎকার করে অতনুকে ডাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে একটা আর্ত গোঙানি ছাড়া কোনো শব্দই বের হলো না। পরক্ষণেই অতনুর আর্তনাদে বন্ধ ঘরের সীমা ছাড়িয়ে, বাইরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অরণ্য প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

ভয়ে আতঙ্কে বিছানার ওপর উঠে বসল অনিল। প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, অতনু...

বন্ধ দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে অনিলের সর্বাংগে ঝাপটা মারতেই ও প্রাণভয়ে মরিয়া হয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। আতংকে ভয়ে খোলা দরজা দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

বিরজু আশেপাশের বাড়ির লোকজনদের সংগে নিয়ে অচেতন অনিলকে খুঁজে বার করে যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন ভোর হতে আর দেরি নেই। খোলা দরজা দিয়ে হলঘরের ভেতরে ঢুকে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সারা ঘর লন্ডভন্ড। যেন প্রচন্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে। মেঝের ওপর ভাঙা ফ্রেমের চূর্ণবিচূর্ণ কাঠামোটা পড়ে। অতনুর আঁকা সিকান্দার বেগের সেই জিঘাংসু রক্তলোলুপ ছবিটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘরময় উড়ছে।

মেঝের একধারে লুটিয়ে পড়ে আছে অতনু। ও বোধহয় ওর সৃষ্টিকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিল! পারেনি!

ওর হাতের মুঠোর ভেতর ধরা সিকান্দার বেগের সেই আসল ছবিটা দোমড়ানো, মোচড়ানো। সেটাও অক্ষত নেই।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অতনু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল অনিলের মুখের দিকে। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, সিকান্দার বেগ তার ছোরা হাতে নিয়েই এসেছিল। ও চায় না ওর ছবি কেউ আঁকুক। আমিও আর আঁকতে পারব না রে।

ছবি : সরোজ সরকার

মামদোকে ভূতে ধরেছে

রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সামনে এ্যানুয়াল পরীক্ষা। আমরা সবাই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক এই সময়েই খবর পাওয়া গেল মামদোকে ভূতে ধরেছে।

একেবারে শহরের মধ্যে ভূত? তাও আবার ধরল কিনা মামদোকে?

মন্টু বলল—ইস্ এ্যানুয়াল পরীক্ষার আগেই ভূতে ধরল! নিশ্চয়ই ভূতটা মানুষ অবস্থায় ছাত্র ছিল।

ইন্দ্র মুখখানাকে গম্ভীর করে বলে—ওদের রান্নাঘরের পেছনে একটা বিশাল গাব গাছ আছে। গাছটাকে দেখলেই আমার কেমন ভয় ভয় করতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওখানেই কোনো গোলমাল আছে, এখুনি ওঝা ডেকে গাছটাকে ভালভাবে ঝাড়ফুঁক করানো দরকার।

ভূপাল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মাথা নেড়ে বলল—আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই উচিত মামদোকে একবার দেখে আসা। খেলার জন্য বরাদ্দ সময়ের মধ্যে আমরা স্বচ্ছন্দে মামদোকে দেখে আসতে পারবো। প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ। সুতরাং আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

ঠিক সন্ধ্যের মুখেই মামদোদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। বাড়িটা কেমন যেন থমথমে। রান্নাঘরের পেছনে গাব গাছটার দিকে একবার তাকিয়েই ইন্দ্র আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমিও একবার তাকালাম। হ্যাঁ সত্যিই গাছটা যেন কেমন অদ্ভুত। পাতাসুদ্ধ ডালগুলোর নড়াচড়া দেখলে মনে হয় ওগুলো যেন হাওয়ায় নড়ছে না, কেউ যেন মৃদুভাবে ঝাঁকাচ্ছে।

ইন্দ্র কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মামদোদের ঘরের জানালা দিয়ে একটা চামচ সজোরে এসে ঠকাস করে বুদ্ধর মাথায় লাগলো।

বুদ্ধ চামচটা কুড়িয়ে নিতেই ভেতর থেকে মামদোর চিৎকার ভেসে এলো, "নিয়ে যাও, আমি কিচ্ছু খাব না।" বুদ্ধ সকলের দিকে একবার চেয়ে বলল, চল ভেতরে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার!

আমরা দরজার কড়া নাড়লাম। কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে দিলেন মামদোর বাবা। ওঁকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমাদের দেখে বললেন—এসো। ভেতরে এসো।

আমরা ভেভরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেসোমশাই মামদোর কি হয়েছে, কদিন ও খেলতে যাচ্ছে না তো?

—কি হয়েছে তা তো জানি না বাবা তবে ডাক্তাররাও ওর কোনো অসুখ ধরতে পারছে না। প্রতিবেশীদের দু একজন বলছে ভূতে ধরেছে।

বুদ্ধ বলল—মেসোমশাই আমরা একটু মামদোর সংগে দেখা করবো?

—যাও। মামদোর ঘরেই ও আছে। তবে দেখো অনেক সময় ও তেড়ে অনেককে মারধোর করতে যাচ্ছে। সেরকম কিছু হলে তোমরা কিছু মনে কর না বাবা।

এবার যেন ইন্দ্রকে একটু ধাতস্থ মনে হলো। ইন্দ্রই তাড়াতাড়ি বলল, না না আমরা কিছু মনে করবো না।

মামদোর ঘরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলাম, ও বিছানাটা খাট থেকে নিচে নামিয়ে তার ওপর শীর্ষাসন করার ভংগিতে পা ওপরে মাথা নিচের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম—এই মামদো পা নামা।

কথায় কাজ হলো। মামদো পা নামালো। কিন্তু চোখের পাতা পড়ছে না। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার বুকের ভিতর টিপ টিপ করলেও মুখে বললাম—কিরে কি হয়েছে তোর? শুনলাম তুই নাকি অসুস্থ?

মামদোর মুখে কোনো কথা নেই।

কয়েক সেকেন্ড এভাবে থেকে মামদো হঠাৎ প্যান্ডেলে আরতি করার ভংগিতে নাচতে আরম্ভ করলো। মুখে ঢাকের বোল তুলে বলছে—টানাক—ট্যাং-ট্যাং...

মন্টু ফিসফিস করে বুদ্ধকে বলল—লক্ষণ দেখে তো মনে হচ্ছে পাগলামি। মামদো কি পাগল হয়ে গেল?

কিছুক্ষণ নাচার পর মামদো থেমে গেল। কিন্তু হাঁপাচ্ছে। এবার বুদ্ধর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলার স্বরে বলল—আমার নাম শেখ আহমেদ আলি, সাকিন বোয়ালমারি, থানা দৌলতপুর। বাপের নাম রহমত মিঞা। আমার দুই ভাই আছে। একজনের নাম খোদাবক্স, আরেক জনের নাম আজাহার। আমার বিশ বিঘে ধানের জমির মধ্যে আজাহর ছয় বিঘে নিয়ে নিয়েছে। তোমরা তার কিছু করতে পারলে? এখানে কি আমার মুখ দেখতে এসেছো? মোড়লকে ডাক, আগে বিচারহোক, তারপর অন্য কথা।

মন্টু বলল—তা আহমেদ আলি ভাই আপনি মামদোকে দয়া করে ছেড়ে দিন। ওর সামনেই এ্যানুয়াল পরীক্ষা। পরীক্ষা হয়ে গেলে বরং আমরা মোড়লকে ডেকে বলে কয়ে আপনার জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবো।

মামদো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ওসব গুলতাপ্পি অনেক শুনেছি, আগে মোড়লকে ডাক, বিচার হোক, আমার জমি আজাহার ছেড়ে দিক, তারপর অন্য কথা।

এমন সময় মামদোর মা ধ্রুবকে ডেকে বললেন—বাবা ও অনেকক্ষণ কিছু খায়নি, যা দিচ্ছি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, তোমরা দেখো তো ওকে একটু খাওয়াতে পারো কিনা।

আমি বললাম—ঠিক আছে নিয়ে আসুন মাসীমা, আমরা চেষ্টা করে দেখি।

মাসীমা এক থালা ফুলকো লুচি আর সংগে কিছু আলুভাজা নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অমিত থালাখানা মাসীমার হাত থেকে নিয়ে বলল, মাসীমা আপনি যান, আমরা দেখছি কি করতে পারি।

মাসীমা চলে যেতেই মামদো খুব গম্ভীরভাবে বলল, তোমরা কারা?

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আপনি যার ঘাড়ে চেপেছেন, তার নাম মামদো, আমরা সব মামদোর বন্ধু।

মামদো ওরফে শেখ আহমেদ আলি কি যেন ভাবলো। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে বলল—তা তোমরা আমাদের বাড়ি এলে, একটু লুচিই খাও।

বুদ্ধ আমার কানে কানে বলল—সম্ভ্রান্ত চাষী পরিবার। মৃত্যুর পরেও ভদ্রতাটুকু ভোলেনি। মনে হয় একটু অনুনয় বিনয় করলে মামদোকে ছেড়ে দিতে পারে।

আমি বললাম—একটু রিকোয়েস্ট কর না!

বুদ্ধ কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মামদোর বাবা ঘরে ঢুকলেন। আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—তোমাদের হেড স্যার এসেছেন। ওঁকে এখানে পাঠানোটা কি ঠিক হবে?

মামাদো যেন হুংকার দিয়ে বলল, কি হলো, তোমরা খাচ্ছো না যে? আচমকা হুংকারে অমিতের হাত থেকে লুচির থালাখানা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

হেড স্যার ঘরে ঢুকলেন। মামদো ওঁকে দেখেই হঠাৎ মাথা নিচু করে সামনে একটু ঝুঁকে অনেকটা যাত্রায় নবাবকে কুর্ণিশ করার ভংগিতে বলে উঠলো, আসুন আসুন মোড়ল মশাই, খবর ভালো তো?

হেড স্যার হকচকিয়ে গেলেন। মুখে কোনো কথা না বলে একটু হাসলেন। হেড স্যারের মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল উনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

মামদো ভ্রূ কুঁচকে বড়দের মতো ভংগি করে বলল, তা মোড়ল মশাই সেদিনের ঝড়ে বসির আলির ঘরের টিন উড়ে গিয়ে পড়ল হেমেন মন্ডলের উঠোনে। বসির বলে, হেমেন, ও টিন আমার, তুই দিয়ে দে। হেমেন উত্তর দেয়, টিনের গায়ে কি তোর নাম লেখা আছে যে তোকে দেবো?

তা এ অবস্থায় আপনি কি বিচার করবেন?

আবার দেখুন হেমেন মণ্ডলের আমগাছ আর নারকেল গাছ ঝুঁকে পড়েছে কেষ্ট বিশ্বাসের বাগানে। এখন কেষ্টর দাবি গাছের ফল যদি তার বাগানে পড়ে, তো সে ফল তার। এর ন্যায্য বিচার করলে কি দাঁড়ায় বলুন তো?

আমরা নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। বুদ্ধ ফিসফিস করে বলে—হেড স্যার চিরকাল ছাত্রদের প্রশ্ন করে এসেছেন, এখন ছাত্র প্রশ্ন করায় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন, দেখ্! ইন্দ্র হেড স্যারের অস্বস্তি কাটাতে তাড়াতাড়ি বলে, ও এখন সোমনাথ পাল নয় স্যার, ওর নাম শেখ আহমেদ আলি।

কথাটা বোধহয় মামদোর কানে গেছে। ও চোখ বড় বড় করে বলে, আমি যেই হই, আপনি তো মোড়ল, বিচারটা কি লোক দেখে হবে না দোষ বুঝে হবে?

মামদো বড় বড় চোখে হেড স্যারের দিকে এগোতে থাকে। হেড স্যারও পায়ে পায়ে পেছোতে থাকেন। দু পা পেছোবার পরেই মামদোর বাবার ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন। মামদোর বাবা টাল সামলাতে না পেরে অমিতকে ধরতে চাইলেন, অমিতের হাতে লুচির থালা থাকায় বেচারী ব্যালান্স রাখতে না পেরে ইন্দ্রর গায়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল। ঝনঝন করে থালা মেঝেতে পড়ল।

পরের দিন বাড়িতে বসেই শুনলাম বেচুদা আর বিশুকাকা ওঝা আনার ব্যবস্থা করেছেন।

একদিকে পরীক্ষার পড়া তৈরির কড়াকড়ি, অন্যদিকে দুই ওঝার ঝাড়ফুঁক দেখার অদম্য ইচ্ছা। দোটানায় পড়ে আমরা সবাই ভাবছি কি করবো। শেষকালে অনেক অনুনয় বিনয় করার পর খানিকক্ষণ দেখে আসার অনুমতি পাওয়া গেল।

আমরা প্রায় ছুটতে ছুটতে মামদোদের বাড়িতে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে ওঝা এসে পৌঁছেছে। কপালে গঙ্গামাটি আর সিঁদুরে মাখামাখি। কপালের দুপাশে দুটো তুলসী পাতা আটকানো। পান খেয়ে দাঁতগুলো তেঁতুল বিচির মতো কালো। নাকের ওপর একটা রসকলি

আসুন, আসুন মোড়ল মশাই, খবর ভালো তো?

আঁকা। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গায়ে ফতুয়া। কাঁধে একটা নামাবলী ভাঁজ করে রাখা। অন্য কাঁধে বাউলদের মতো কাঁথা দিয়ে তৈরি একটা বিরাট ঝোলা। আমরা বলাবলি করলাম, ওই ঝোলার মধ্যেই ভূত তাড়ানোর যাবতীয় জিনিস। ওঝার নাম বসন্ত বৈরাগী।

মামদোর মা যত্ন করে খেতে দিলেন বসন্ত ওঝাকে। উনি বেশ পরিতোষ করে খেয়ে বড়সড় একটা ঢেঁকুর তুলে বললেন—রোগী কোথায়!

বুদ্ধ তাড়াতাড়ি বলল—আসুন আমার সংগে।

বসন্ত ওঝা বুদ্ধর পেছন পেছন গেলে মেসোমশাই বললেন—বাপী শোন, এসব ওঝা-টোঝা কি মামদোকে খুব মারধোর করবে? আমার ভাল লাগছে না, পরীক্ষার আগে বেশি মরধোর কি সহ্য করতে পারবে?

—আপনি কিছু ভাববেন না মেসোমশাই, আগে ব্যাপারটা কি হয় দেখে নিই। তারপর সেরকম বুঝলে আমরাও ওঝার ভূত ভাগিয়ে ছাড়বো।

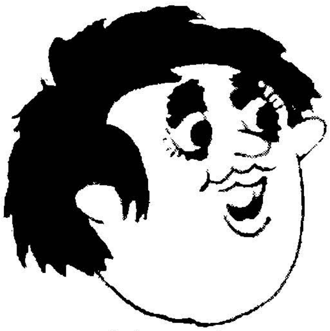

মামদোর ঘরের সংগেই টানা বারান্দা। সেখানে একটা জানালা আছে। ও জানালার গরাদ ধরে তাকিয়েছিল। বসন্ত ওঝা আর মামদো দুজনে দুজনের দিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

শুনেছি এসব ব্যাপারে ওঝা বাড়িতে পা দিলেই নাকি ভূতে পাওয়া মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে। কিন্তু মামদো নির্বিকার। একদৃষ্টে চেয়ে আছে বসন্ত ওঝার দিকে। বসন্ত ওঝা একটা পিঁড়ি পেতে বারান্দায় বসল।

তারপরেই তার ঝোলা থেকে বেরোতে লাগলো সব বীভৎস জিনিস। একটা মড়ার মাথার খুলি, একটা হাড়। কতগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। কতগুলো রুদ্রাক্ষের গুটি। গুটিগুলো নৈবেদ্যর মতো তিন চার ভাগে রাখলেন। তারপর এক দামে আধসের সর্ষে কিনে আনতে বললেন।

ভূতের ভয় ইন্দ্ররই একটু বেশি বলে ইন্দ্রই ছুটলো সর্ষে আনতে। জানালা দিয়ে মামদো সব দেখছে। ওর কিন্তু এতটুকু চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে না। বরং একমনে ওঝার বিচিত্র ধরনের নানা উপচার সাজানো দেখছে।

ইতিমধ্যে বসন্ত ওঝা একটা বিড়ি ধরিয়েছে। তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিল। আমরা বসন্ত ওঝার ক্রিয়াকলাপ দেখবার জন্য একটু দূরেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিমর্ষ মুখে মাসীমা আর মেসোমশাই বারান্দার এক কোণে দুটো চেয়ারে বসে আছেন। মেসোমশাই ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বললেন, বসন্ত ওঝার কানে কানে বলে দাও, ওর কথামতো আমরা আধ ধামা খই আর আধ হাঁড়ি ক্ষীর তৈরি করে রেখেছি। দরকার হলেই যেন চেয়ে নেয়। একটা নারকেল শলার ঝাঁটাও আছে। তবে বলে দিও মামদোকে যেন বেশি মারধোর না করে।

—বললাম যে আপনি ভয় পাবেন না। সেরকম হলে বসন্ত ওঝাও অক্ষত শরীরে ফিরতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ইতিমধ্যে ইন্দ্র সর্ষে এনে হাজির। বসন্ত ওঝা সর্ষেগুলো হাতে নিয়ে আবার একবার মামদোর দিকে তাকাল। তারপর মামদোর মাকে বলল সর্ষেগুলো পুড়িয়ে দিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসীমা সর্ষেগুলো পুড়িয়ে এনে দিলেন। এত দিন শোনা গল্পের অভিজ্ঞতায় জানি সর্ষে পুড়িয়ে ভূত তাড়ায়, আজ চাক্ষুষ দেখার সুযোগে আমি মনে মনে ভূতে ধরেছে বলে মামদোকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলাম। তবে সময়টা খারাপ, পরীক্ষা একেবারে সামনে।

পোড়া সর্ষের থালা হাতে নিয়ে বসন্ত ওঝা এক অদ্ভুত নাচ আরম্ভ করল। আর থালা থেকে সর্ষে মুঠোয় নিয়ে লাফিয়ে উঠে সজোরে সর্ষেগুলো মাটিতে আছড়ে ফেলতে শুরু করল। শোনা গল্প অনুযায়ী মামদোরও যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু মামদো জানালার গরাদ ধরে যেন রগড় দেখছে।

কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলবার পর বসন্ত ওঝা জামা খুলে ফেলল। খালি গা, হাঁটুর ওপরে কাপড়। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। শুরু হলো আবার নাচ। এবার পোড়া সর্ষে মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই এক খাবলা সর্ষে পোড়া মামদোর দিকে ছুঁড়ে দিল। মামদো ঠিক প্রস্তুত ছিল না। আচমকা চোখে মুখে সর্ষে পোড়া এসে পড়ায় মামদো ঘরের ভেতর মুখ লুকালো। সংগে সংগে জানালাটাও বন্ধ হয়ে গেল। বসন্ত ওঝার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। নাচের সংগে উদ্ভট প্রক্রিয়াও চলেছে। কয়েক মিনিট পরেই মামদোর ঘরের

দরজা খুলে গেল। মামদো বেরিয়ে এল রণংদেহী মূর্তিতে। কোনো কথা নয়, প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বসন্ত ওঝার দিকে। দুহাতে তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠোনের ধারে। ক্যাঁক্ করে একটা আওয়াজ করে স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো বসন্ত ওঝা। মামদো ইতিমধ্যে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সংগে সংগে কোঁৎ করে পেটে একটা ঘুষি চালালো মামদো।

পরক্ষণেই বসন্ত ওঝা খোলা দরজা দিয়ে পাঁই পাঁই ছুট। জিনিসপত্র সব যেমন ছিল পড়ে রইল। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। ঘুরে এসে বলল, বসন্ত ওঝা স্বচ্ছন্দে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে 100 মিটার দৌড়ে নাম দিতে পারে। এ বয়সেও ভাল স্পীড আছে—দেখলি?

ঘটনাটা দারুণ সিরিয়াস। অথচ চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কান্ডকারখানা দেখে আমার দারুণ হাসি পাচ্ছে। ভূত তাড়াতে এসে শেষে কিনা ভূতের মার খেয়ে ওঝা পগারপার। এ দৃশ্য খুবই অভাবনীয়। মামদো তখনও রাগে ফুঁসছে। আমাদের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে গটগট করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমরা হতভম্ব। মেসোমশাইয়ের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। চুপচাপ বসে আছেন। মাসীমা চোখের জল মুছলেন।

এর পরেই বিশুকাকা ঢুকলেন সংগে আর একজন ওঝা নিয়ে। এ ওঝার নাম আতর আলি। এ লোকটার ষন্ডামার্কা চেহারা। ঝাঁকড়া চুল। খালি গা। পরনে একটা লুংগি। বিশুকাকা ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। এক মিনিট কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়ানো ওঁর কোষ্ঠীতে লেখা নেই। এসেই হাঁক ডাক আরম্ভ করে দিলেন। মেসোমশাইয়ের সামনে গিয়ে হাত পা নেড়ে কত কষ্ট করে আতর আলিকে নিয়ে এসেছেন তার ফিরিস্তি দিলেন।

ইতিমধ্যে আতর আলি মামদোর ঘরের সামনে এসে বসন্ত ওঝার সাজানো জিনিসপত্রের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাদের উদ্দেশ করে বলল, এগুলো তুলে ফেলুন।

আমরা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র বসন্ত ওঝার ফেলে যাওয়া ঝোলার ভেতর পুরে দিলাম। বুদ্ধ ততক্ষণে কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা আতর আলিকে বলতে শুরু করেছে। বিশুকাকা ছুটে এসে হাত পা নাড়তে নাড়তে এবং সেই সংগে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বেশ উত্তেজিত ভাবেই ঘটনাটা শুনলেন। বুদ্ধর কথা শেষ হতেই বললেন, আতর আলি আর দেরি নয় ভাই, কাজ শুরু করে দাও। ছেলেটার সামনেই পরীক্ষা। তুমি যদি ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ভূত তাড়িয়ে দিতে পারো তবে আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে ও ওর পড়াশুনা আরম্ভ করে দিতে পারে।

আতর আলি ঝাঁকড়া চুলে একবার হাত বুলিয়ে বলল—দেখি চেষ্টা করে।

তারপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাখালদের গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো কয়েকবার আওয়াজ করল। হুররা...হুররা...টাক টাক... বিচিত্র সব শব্দ। এই ওঝাও বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল, যার মধ্যে কয়েকবার জিন-জিন কথাটা আমার কানে এলো।

বুদ্ধ চট করে আমার কাছে এসে বলল, বাপী আতর আলির যা চেহারা দেখছি, মামদোকে দু-চার ঘা দিলে আর দেখতে হবে না। আমরাও খালি হাতে খুব একটা সুবিধা করতে পারবো না। সুতরাং প্রত্যেকেই হাতে হাতে লাঠি, ব্যাখারি, বাঁশ নিয়ে তৈরি থাকি। বেগতিক দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চোখের সামনে ভূত তাড়ানোর নামে মামদোকে মারধোর করে যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, এ অসম্ভব।

বুদ্ধ আমাদের সকলকেই এভাবে তৈরি হতে বলছে, ইতিমধ্যে আতর আলি মামদোর ঘরে ঢুকে গেল। ঢোকবার আগে বলল, আপনারা দয়া করে কেউ ঘরে ঢুকবেন না বা দরজাটা খুলবেন না। আমি বললে তারপর খুলবেন।

আমরা চটপট সারাবাড়ি খুঁজে যে যা পেরেছি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালাম। বুদ্ধর দু হাতে দুটো দরজার খিল। ইন্দ্রর হাতে বাটনা বাটার নোড়া। আমার হাতে কয়লা ভাংগার লোহা। কমল নিয়েছে একটা কুড়োলের হাতল ইত্যাদি। হঠাৎ বিশুকাকার নজর পড়তেই উনি হৈ হৈ করে উঠলেন।

—তোরা কি একটা দাংগা হাংগামা করবি নাকি?

বুদ্ধ খিল দুটো মজবুত করে ধরে বলল—তোমার আতর আলি যদি মামদোকে মারধোর করে বিশুকাকা, তাহলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।

—আরে তোরা পাগল হলি নাকি? মারধোর করলে মামদোর গায়ে একটুও লাগবে না, সব ভূতের পিঠেই পড়বে।

ইন্দ্র বলল— দেখো বিশুকাকা আমাদের বোঝাতে এসো না। ভূত নিরাকার। শরীরটা তো মামদোর।

বুদ্ধ এতক্ষণ বিশুকাকার সংগে কথা বলছিল কিন্তু চোখ রাখছিল মামদোর ঘরের দিকে। বিশুকাকা ইন্দ্রর সংগে কথা আরম্ভ করতেই বুদ্ধ এক লাফে মামদোর

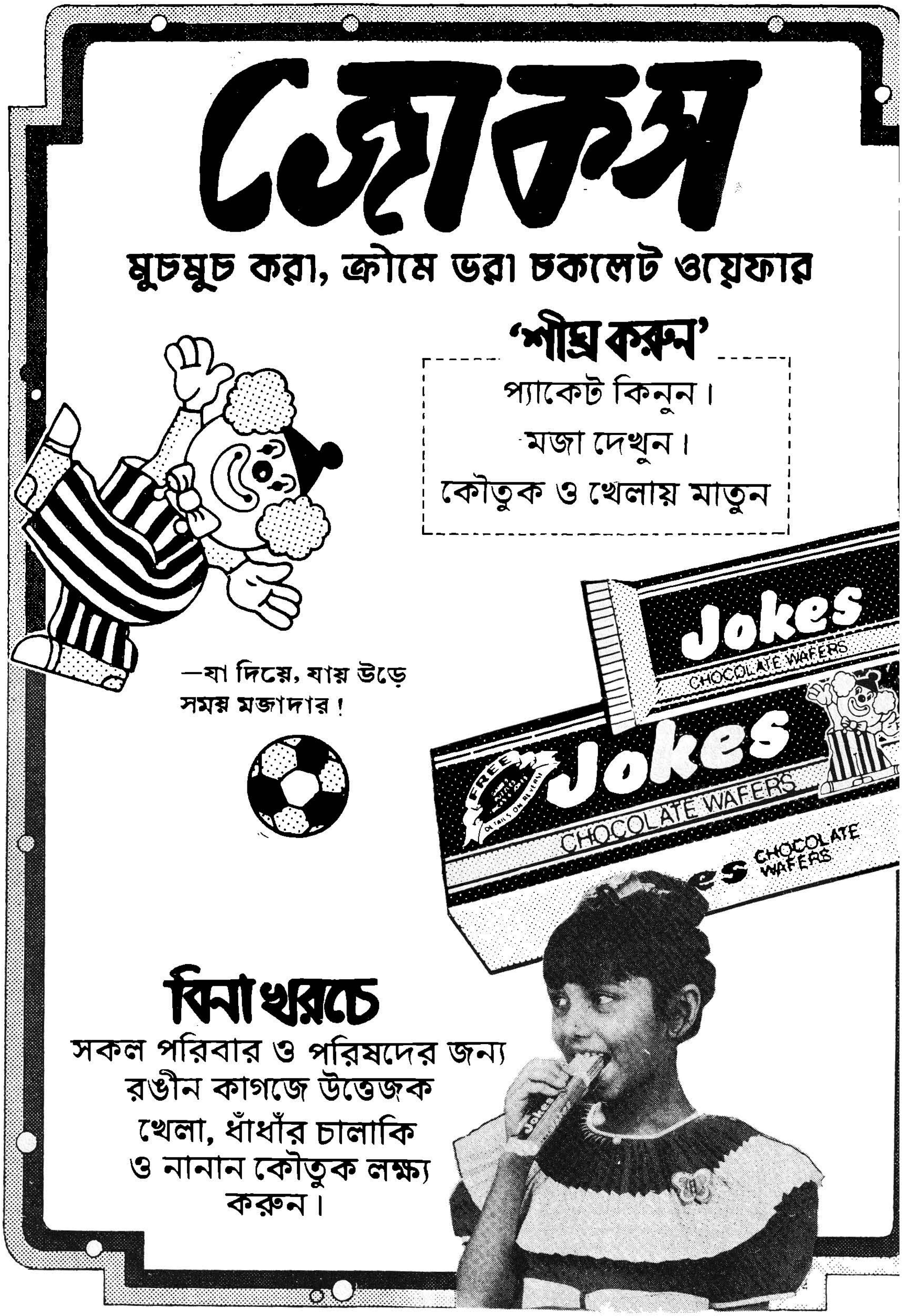

জোকস
মুচমুচ করা, ক্রীমে ভরা চকলেট ওয়েফার
'শীঘ্র করুন'
প্যাকেট কিনুন।
মজা দেখুন।
কৌতুক ও খেলায় মাতুন
—যা দিয়ে, যায় উড়ে
সময় মজাদার !
Jokes
CHOCOLATE WAFERS
Jokes
CHOCOLATE WAFERS
FREE
CHOCOLATE
WAFERS
বিনা খরচে
সকল পরিবার ও পরিষদের জন্য
রঙীন কাগজে উত্তেজক
খেলা, ধাঁধাঁর চালাকি
ও নানান কৌতুক লক্ষ্য
করুন।

ঘরের দরজায় গিয়ে কান পেতে রইল। ইশারায় আমাদের জানালো, না সেরকম সন্দেহজনক কোনো আওয়াজ আসছে না।

মামদোর ঘর থেকে বিন্দুমাত্র আওয়াজ আসছে না দেখে আমরা অবাক। আশা করেছিলাম ওখান থেকে নিশ্চয়ই বেশ বড় ধরনের কোনো চিৎকার বা মারামারির শব্দ আসবে। কিন্তু কিছুই আসছে না দেখে আমরা একটু হতাশ হয়ে যাচ্ছি।

বারান্দার একপাশে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন মেসোমশাই আর মাসীমা।

আমরা কিছু একটা ঘটবার এবং কিছু একটা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ কিছুই ঘটছে না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আতর আলি।

আমরা হাতের হাতিয়ারগুলো তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে আতর আলিকে ঘিরে ধরলাম। আতর আলি ভয়ংকর গম্ভীর। আমাদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বিশুকাকার দিকে এগিয়ে গেল। বিশুকাকার কানে কানে কি বলতেই বিশুকাকা মেসোমশাইয়ের দিকে ছুটে গেলেন।

তিনজনে কি যেন ফিসফাস করে মিনিট দশেক কথাবার্তা বলল। বুঝলাম এ আলোচনা আমরা শুনতে পারবো না। কিন্তু তবু কি হলো জানবার জন্য ভেতরটা ছটফট করছে। আতর আলি কোনো টাকাপয়সা না নিয়েই বেরিয়ে গেল। কৌতূহলী যাঁরা দু চারজন এসেছিলেন তাঁরাও চলে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি প্রায় ফাঁকা।

আমরা মেসোমশায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম–ব্যাপারটা কি হলো ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে। যদি একান্তই গোপন না হয়, তাহলে একটু বলুন না!

মেসোমশাই কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন। দুঃখপূর্ণ স্বরে বললেন, ভূতে ধরেছে ঠিক। তবে জোর করে এ ভূতকে তাড়াতে গেলে মামদোর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। মাসখানেক মাস দেড়েক পরে আপনিই চলে যাবে। তবে এই সময়টুকু যেন ওকে একদম বিরক্ত করা না হয়। অন্য কোনো ওঝাও আনবার দরকার নেই।

ইন্দ্র সংগে সংগে বলল–আমি বলেছিলাম না, আহমেদ ভাই সজ্জন লোক, অনুরোধ করে বললেই চলে যাবেন।

–মামদো পরীক্ষাটা দিতে পারবে না, এটাই কথা। মাসীমা করুণ স্বরে বললেন।

এরপর আমরা আর মামদোদের বাড়িতে যেতে পারিনি। যথাসময়ে পরীক্ষা হয়ে গেল। রেজাল্ট আউটের দিন সবাই স্কুলে গেলাম। আমাদের বন্ধু-বান্ধব সবাই ভালভাবে পাশ করে উঠেছে।

দু'চারটে দিন বেশ হৈচৈ করেই কেটে গেল। সত্যিকথা বলতে দ্বিধা নেই, মামাদোর ব্যাপারটা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রথম দিন ক্লাশ নাইনে ঢুকে দেখি মামদো ঢুকছে আমাদের সংগে।

কি করে হল? মামদো পরীক্ষা না দিয়ে প্রমোশন পেলো কি করে? মামদোকে ঘিরে ধরলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত মামদো বলল, হেড স্যারের বিশেষ অনুমতিতে শুধু ভূতে ধরেছিল বলেই মামদোকে ক্লাশ নাইনে তোলা হয়েছে।

তারও বেশ কিছুদিন পরে আমি আর মামদো স্কুল থেকে ফেরার পথে কি একটা ব্যাপারে ভূতের প্রসংগ আসতেই আমি মামদোকে জিজ্ঞাসা করলাম, মামদো সত্যি করে বলতো সেদিন আতর আলি ঘরের দরজা বন্ধ করে তোকে কি বলেছিল?

–বল তুই কাউকে বলবি না?

–না। কাউকে বলবো না।

–ওসব ভূত-টূত কিছুই ধরেনি আমাকে। প্রথম ওঝাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিলাম। পরেরটার স্বাস্থ্য দেখে বুঝলাম একে ওভাবে ম্যানেজ করা যাবে না। সোজা বললাম, দেখুন ওঝা ভাই জিন টিন কিছুই আমাকে ধরেনি। পরীক্ষার প্রিপারেশন নেই, এমনিতেই ফেল করবো, একটা চান্স নিচ্ছি যদি স্পেশাল কন্সিডারেশনে পাশ করিয়ে দেয়। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। লোকটা হেসে বলল, আমি আন্দাজ করেছিলাম। যাই হোক তারপর দুজনে পরামর্শ করে ওই রাস্তাটা বার করি। যাকগে এবার প্রথম থেকেই মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে।

–তাহলে ভূত তোকে পাশ করিয়ে দিল বল?

–বাপী তুই কিন্তু কথা দিয়েছিস।

–ঠিক আছে কাউকে বলবো না। আমি হাসতে হাসতে বলি।

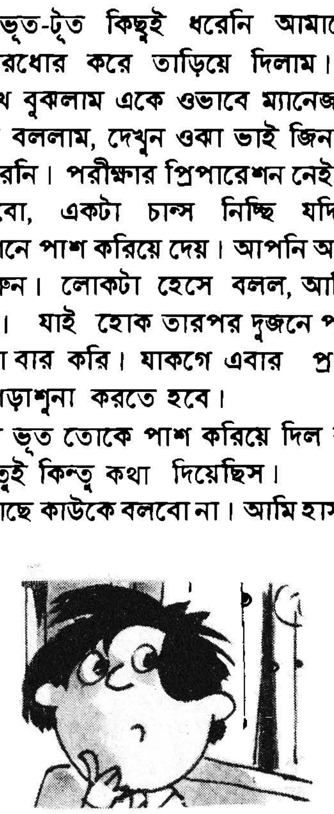

ছবি : সরোজ সরকার

অসাধারণ সব্জীবাগান

নিরঞ্জন সিংহ

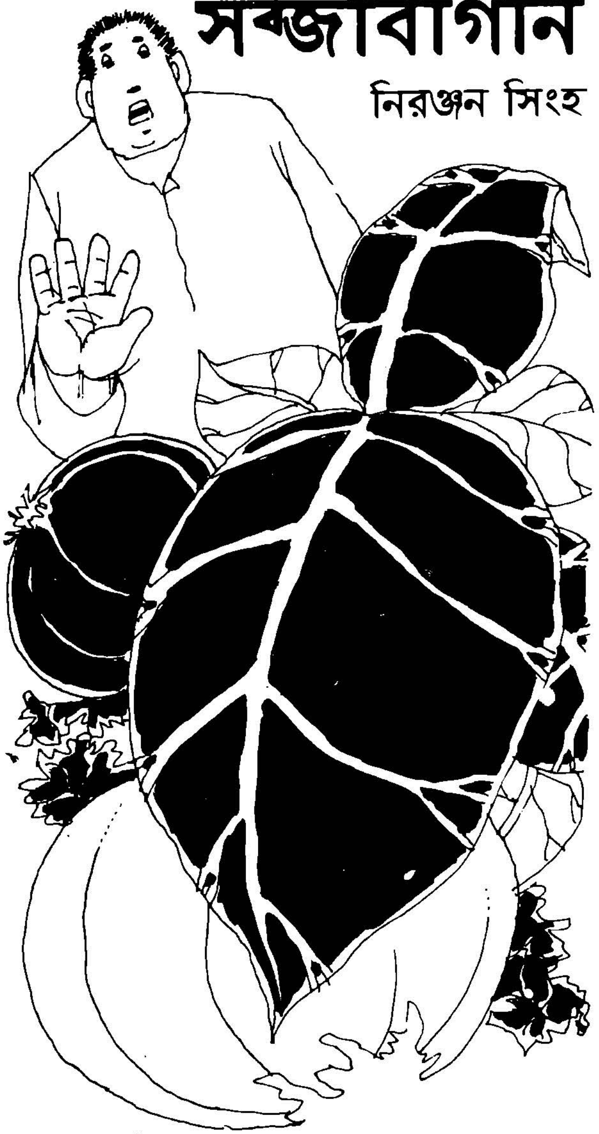

সরকারী আবাসনের এই দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে আসার প্রথম দিনই মনে হয়েছিল একটা ছোট্ট বাগান করতে হবে। পাঁচতলা বাড়িতে দশটা করে ফ্ল্যাট। একতলা যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা সামনের জমি ঘিরে নিয়ে বাগান করেছেন, দেখে বেশ ভালই লাগল।

আমার ঠিক নিচের তলায় আছেন ডঃ অনিমেষ রায়। বিজ্ঞানের অধ্যাপক, রিটায়ার্ড। স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকেন এখানে। এক মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে জামাই থাকে বম্বেতে। মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটায় এখানে আসে। ডঃ রায়ও তাঁর সামনের জমিতে বাগান করেছেন। সবই প্রায় মরশুমী ফুলের গাছ। খুব সুন্দর বাগানটি। দেখলেই বোঝা যায় মালিকের রুচি ও যত্ন দুইই আছে।

আমাদের বিল্ডিংটার পিছনেও যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে; তারপরই লোক চলাচলের রাস্তা। পিছনের দিকের জমিতে বাগান করলে করা যেতে পারে। আমি ওইদিকে নজর দিলাম। ডঃ রায়কে বলতেই এককথায় রাজী হয়ে গেলেন এবং প্রচুর উৎসাহ দিয়ে বললেন, আমাদের প্রত্যেকের উচিত গাছ লাগান, কারণ গাছ সুন্দরের প্রতীক।

–আপনার ফুলের বাগানটা কিন্তু খুব সুন্দর। এত বড় বড় দোপাটি আর সূর্যমুখী ফুল সচরাচর দেখা যায় না। আপনি কি সার দিয়েছেন ? বললাম আমি।

–সেই আদি ও অকৃত্রিম গোবর সার। মালী করালীই যোগাড় করে এনে দিয়েছে। বলে, একটু থেমে আবার বললেন ডঃ রায়, তবে মশায় এখানকার মাটিরও খুব তেজ....।

আমি আমার কৃষি-বিদ্যা জাহির করার জন্য বললাম, বহুদিনের পোড়ো জমি; তেজ তো থাকবেই....।

–আপনিও নিশ্চয় ফুলের বাগান করবেন ? জানতে চাইলেন ডঃ রায়।

–ইচ্ছে তাই, তবে সঙ্গে একটু সব্জীটব্জী করতে পারলে মন্দ হয় না। তবে একফালি তো জমি। অতরকম কি আর করা যাবে ? জবাব দিলাম আমি।

–আসলে পিছনের জমিটাতে একটা সব্জীবাগান করব মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনার যখন বাগান করার শখ, তখন আপনিই করুন। দুদিকের জমি দখল করাটা ভাল দেখায় না, তাই না ? বললেন ডঃ রায়।

আমি মনে মনে ওঁর এই উদার মনোভাবের প্রশংসা করলাম এবং একটু হাসলাম।

–সামনের ফুলবাগান যদিও আমিই করেছি, তবু মনে করি এ বাগান আমাদের দশজনের, সুতরাং এ ফুলবাগান আপনারও বটে। তেমনি আপনার সব্জীবাগানও আমাদের দশজনেরই হবে।

ডঃ রায়ের কথা শুনে আমার ভ্রূটা কুঁচকে উঠল। এই একফালি জমির সব্জী যদি এ বিল্ডিং-এর দশজন বাসিন্দার মধ্যে ভাগ করে নিতে হয় তাহলে কারো ভাগ্যে কিছু পড়বে কি না সন্দেহ। ডঃ রায়ের কথাটা আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার হলো না; কিন্তু এ কথায় আপত্তি করাও চলে না, তাহলে ডঃ রায় আমাকে স্বার্থপর ভাববেন। তাছাড়া ওঁর ফ্ল্যাটের পিছনে বাগান করছি ওঁর কথা না শুনলে খুবই খারাপ দেখায়। তাই আমি একটু হেঁহেঁ করে ওঁর কথাতেই সায় দিলাম, তা তো বটেই, তা তো বটেই।

উনি হয়তো আমার মনের কথা কিছুটা আঁচ করে বললেন, দশ ভাগ করতে গেলে আপনার ভাগে কম পড়বে ঠিকই; কিন্তু মশায় নিজের বাগানের জিনিস দশ জনকে দিয়েথুয়ে খাওয়াই তো আমাদের পুরোনো নীতি, তাই না ? বলে উনি একটু হাসলেন। হাসিটা মজার হাসি।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়!

উনি করালীকে বলে দিলেন। মাঝবয়েসী, বেঁটেখাটো, রোগা; কিন্তু খুবই করিৎকর্মা করালী। দুদিনের মধ্যে বেড়া দিয়ে মাটি কুপিয়ে জমি তৈরি করে ফেলল ও। ভাঙা ইটের টুকরো যা বেরুলো তা দিয়ে প্রায় একশ' ফুট লম্বা পাকা রাস্তা তৈরি করা যেত। আমি হিসেব করে দেখলাম এই দু'দিনে বাগানের জন্য আমার প্রায় শ'পাঁচেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। মনকে প্রবোধ দিলাম টাকার হিসেবের সময় এটা নয়।

সামনে শীত আসছে। করালী বলল, দাদাবাবু, আলু, কপি আর পিঁয়াজ লাগাই, কি বলেন?

বললাম, হ্যাঁ, তাই করো, তবে বেগুন, টম্যাটো আর পালংশাক লাগাও। বেড়ার ধার বরাবর কিছু গাঁদাফুলের চারা অন্ততঃ লাগিয়ে দিও।

করালী হেসে বলল, যে আজ্ঞে।

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাগানে যাই। নিড়েন দিয়ে গাছের গোড়াটোড়াগুলো একটু আধটু খুঁচিয়ে দিই। ঘাস দেখতে পেলে তুলে ফেলি। বাগানের বাকি সব কাজ করালীই করে।

দিন পনেরোর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করে বেশ একটু অবাক হলাম। এরই মধ্যে বাগানের প্রতিটি গাছই অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠেছে। এমন কি বেগুন ও টম্যাটো গাছে ফুলের কুঁড়ি পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। ভাবলাম আজকার উচ্চ-ফলনশীল সব্জী নিয়েও তো নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, করালী হয়তো ওই ধরনের সব্জী বীজটিজ নিয়ে এসেছে। এগুলো ফলন দেয় বেশি এবং বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি।

ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হলে অন্য নানা বিষয়ে আলোচনা করেন; কিন্তু সব্জীবাগানের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কথাটথা বলেন না। আমিই একদিন কথাটা তুললাম। উনি বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে আগেই তো আপনাকে বলেছিলাম এখানকার মাটির তেজ খুব। আর

করালী–মালী হিসেবে ওর তুলনা নেই।

অবাক হওয়ার তখনো বাকি ছিল। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টম্যাটো, পালংশাক দিনে দিনে বাড়তে লাগলো কালকেতুর মতো। প্রায় অবিশ্বাস্য সে বৃদ্ধি। করালী এত দিন খুব খুশিই ছিল নিজের হাতের তৈরি সব্জীদের বাড়বাড়ন্ত দেখে, কিন্তু এবার ও নিজেই ঘাবড়ে গেল।

–দাদাবাবু, ব্যাপারটা কি বলেন দিনি?

–আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না করালী। ভিন্ন জাতের বীজ-টিজ নিয়ে আসোনি তো?

–না বাবু, ওই তো এগারো-বারোর বাগানে লাগিইছি এই একই বীজ, সিখানে তো এমন কান্ড ঘটতিছি না। না দাদাবাবু, এ ব্যাপার-স্যাপার আমার মুটেও ভাল ঠেকতিছে না।

আমি নিজেই হতভম্ব মেরে যাচ্ছি তো করালীর কথার কী জবাব দেব। চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু করালী থামল না। বলল, দাদাবাবু ইখেনে বাগান করা বুধহয় ঠিক হয়নি।

–কেন? জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

–ইখেনে এককালে মানুষ মলি কবর দিত। ইসব মনে লাগছে তিনাদের কান্ড।

করালীর কথা শুনে একটু চমকে উঠলাম। এরকম অদ্ভুত, ভুতুড়ে কান্ডের কথা বাপের জন্মে শুনিনি। তবু আমি করালীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কথায় করালী যে মোটেও আশ্বস্ত হয়নি তা কদিনের মধ্যেই টের পেলাম। কোনো না কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে ও বাগানে ঢোকা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে।

বাড়ির পিছন দিক হলে কি হবে, আগেই বলেছি এদিকে লোকজন ও গাড়ি চলাচলের রাস্তা, তাই আমার এই বিচিত্র সব্জীবাগানের কথা গোটা আবাসন কমপ্লেক্সে প্রচার হতে বেশি সময় লাগল না। উটকো লোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভয়ে আমিও বাগানে ঢোকা প্রায় বন্ধ করে দিলাম।

আমার এক পড়শী এক সার কোম্পানীর মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। একদিন সকালে তিনি তাঁর কোম্পানীর ফটোগ্রাফারকে নিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য আমার বাগানের ছবি তুলবেন এবং আমি কি সার কী পরিমাণে কখন ব্যবহার করেছি

সরাসরি চোরের মাথায় সবটা ঢেলে দিলাম।

তা নোট করে নেবেন। ওঁদের নিয়ে বাগানে ঢুকলাম অনেকদিন পরে। বাগানে ঢুকেই তো দুজনেরই চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড়। পরে যখন জানালাম যে কোনো কৃত্রিম সার ব্যবহার করিনি তখন ভদ্রলোক দুজন বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ বুঝতে পারলাম যে আমি মিথ্যেবাদী না পাগল তাই যেন ওঁরা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকের ছবি তোলা হয়ে যেতেই দুজনে আমাকে কোনোরকমে নমস্কার জানিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

বাড়ির পাশে টিভি সেণ্টার। কে একজন বলল বাগানের কথা নাকি ওঁদের কানেও পৌঁছেছে। ওঁরা নাকি মনস্থ করেছেন বাগানের ভিডিও রেকর্ডিং পল্লীকথা বিভাগে প্রচার করবেন।

কিন্তু এত ব্যাপার সত্ত্বেও করালী বাগান দেখাশোনার কাজ একদম ছেড়ে দিয়েছে। আর আগেই বলেছি লোকের আলতু-ফালতু প্রশ্নের ভয়ে আমিও প্রায় বাগানে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছি; তাতে বাগানের শাকসব্জীর বাড়বাড়ন্ত কিন্তু মোটেও কমেনি। মিষ্টি কুমড়োর মতো টম্যাটো, বড় ঝুড়ির মতো বাঁধাকপি, ফুলকপি আর একমানুষ উঁচু পালংশাকে বাগান প্রায় ভর্তি। দেখে আমার গর্বে বুক ফুলে ওঠার কথা ছিল; কিন্তু তার বদলে কীসের একটা ভয়ে যেন সব সময় তটস্থ হয়ে আছি।

এর মধ্যে একদিন বাগানের মাটির নমুনা আমার বন্ধু বিজয়কে দিয়ে এলাম পরীক্ষা করে দেওয়ার জন্য। বিজয় সয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাজ করে। কিন্তু দেখা গেল মাটি পরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এবার সত্যিসত্যি আমিও ঘাবড়ে গেলাম। তাহলে কি করালীর কথাই সত্যি?

পালংশাক তুলে ভাগ করে প্রতিবেশীদের ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়েই বিপত্তি শুরু হলো। ওই ভুতুড়ে শাক খেতে কেউ রাজী নয়। ডঃ রায় অবশ্য মুস্কিল আসান করলেন, না, আমাদের কুসংস্কার আর যাবে না। এত সুন্দর টাটকা ভিটামিনযুক্ত পালংশাক খেতে ভয় পাচ্ছে? ঠিক আছে আমি খেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এ পালংশাক খেলে মরার ভয় নেই, এমন কি শরীর খারাপ হওয়ারও চিন্তা নেই।

সত্যি সত্যি ডঃ রায়ই ওই পালংশাকের বোঝা থেকে আমাকে মুক্ত করলেন। এরপর থেকে অবশ্য বাগানের তরিতরকারি খেতে কেউ আর কোনো আপত্তি তোলেননি। আমরা নিজেরাও খেয়ে দেখলাম। দারুণ টেস্ট!

ইতিমধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে বাগানসহ আমার ছবি ও সাক্ষাৎকার বেরুলো। টিভির লোকেরাও ভিডিও ছবি তুলে নিয়ে গেল বাগানের। ডঃ রায় রহস্য করে বললেন, এক বাগান করেই দেখছি আপনি মশায় বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আমি জবাবে একটু হেঁহেঁ করে হাসলাম।

হঠাৎই একদিন বাগান থেকে একটা বাঁধাকপি চুরি হয়ে গেল। খুবই স্বভাবিক। সব যে তুলে নিয়ে যায়নি এই যথেষ্ট। তবে এই একটা বাঁধাকপি বয়ে নিয়ে যেতেই চোরকে যে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ রইল না।

এরপর থেকে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পিছনের বারান্দায় এসে একবার বাগানটায় উঁকি দিয়ে যেতাম। সেদিন হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের ভিতরে যেন একটা মানুষ নড়াচড়া করছে। লোকটার হাতে কী যেন একটা রয়েছে। লোকটাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। কাউকে কিছু না বলে দরজা খুলে নিচে নেমে গেলাম। চোরকে আজ হাতেনাতে ধরব। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, নিচে নেমে দেখি বাগান ফাঁকা। বাগানের দরজায় যেমন তালা দেওয়া ছিল তেমনি তালা ঝুলছে। এত তাড়াতাড়ি চোর কি বেড়া টপকে পালালো? নাকি আমিই ভুল দেখলাম? চুপচাপ উপরে উঠে এলাম। ঘড়ি দেখলাম বারোটা বেজে পাঁচ। কাউকে কিছু বললাম না। পরদিন জেগে রইলাম। বারোটা বাজতেই পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক সময়েই এসেছি। চোর বাবাজী লোভে লোভে আজও বাগানে ঢুকেছেন। ডাইনিং টেবিলের উপর জল ভর্তি জগটা ছিল। তুলে নিয়ে সরাসরি চোরের মাথায় সবটা ঢেলে দিলাম। ঠাণ্ডা জল মাথায় পড়তেই যে বেচারা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে তা বুঝতে আমার অসুবিধা হলো না। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে নিচে ডঃ রায়ের জানলার কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। আমি দরজা খুলে নিচে ডঃ রায়ের দরজার কলিং বেলের সুইচে চাপ দিলাম।

দরজা খুলে দিলেন ডঃ রায় নিজে। ভিজে চুপসে গেছেন। আমাকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আসুন ভিতরে আসুন।

আমি ঢাললাম চোরের মাথায় জল, আর ভিজে চুপসে গেলেন ডঃ রায়। রহস্যটা কি? ডঃ রায় বাগানে চুরি করতে ঢুকবেন এ কথাই বা মেনে নিই কি করে? আমি আমতা আমতা করে বললাম, আপনার জানলার কাচ ভাঙার শব্দ শুনে ছুটে এলাম।

–ভিতরে ঢুকুন মশাই, সবই জানতে পারবেন। বললেন ডঃ রায়।

আমি ভিতরে ঢুকে ড্রইংরুমে বসলাম।

একটু ঠিকঠাক হয়ে আসি। বলে উনি ভিতরে চলে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিজে জামাকাপড় পাল্টে ফিরে এলেন ডঃ রায়। তারপর সোফায় বসতে বসতে একটু হেসে বললেন, এভাবে ধরা পড়ে যাব বুঝতে পারিনি। এত রাতে ঠাণ্ডাজলে ভিজে এখন নিউমোনিয়া না হলেই বাঁচি।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। ডঃ রায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, আপনার কোনো দোষ নেই। ব্যাপারটা আমিই রহস্যময় করে তুলেছিলাম। আগেই সব খুলে বলা উচিত ছিল। বলিনি একটা কারণে। এক্সপেরিমেণ্টটা সফল হচ্ছে কি না তা না দেখে আমি সবাইকে জানাতে চাইছিলাম না। একটু

থামলেন ডঃ রায়। আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ডঃ রায়ের কথা শুনে যে একটা কথাও বলতে পারলাম না। ডঃ রায় আবার শুরু করলেন, আচমকা মাথায় জল পড়তেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, আলট্রাসোনিক গানের মুখটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল জানলার দিকে এবং তার পরিণতি ঝনৎকার করে কাচের জানলা ভাঙা। আলট্রাসোনিক বা সুপারসোনিক কথাটা নিশ্চয় শুনেছেন!

আমি ঘাড় কাৎ করে সায় দিলাম।

ডঃ রায় শুরু করলেন, সোজা কথায় বলতে গেলে এ হচ্ছে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ, যে শব্দতরঙ্গ আমরা কানে শুনতে পাই না। যাহোক একটা আলট্রাসোনিক গান আমার কাছে আছে। বাসনকোসন মাজা, কাপড়চোপড় কাচার কাজের জন্য। জানেন তো আজকাল কাজের সহাযতা করার লোক পাওয়া কী প্রচণ্ড সমস্যার ব্যাপার। একদিন একটা প্রবন্ধে পড়লাম যে কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পার্ল উইনবারজার লেটুস শাকের উপর আলট্রাসোনিক তরঙ্গ প্রক্ষেপ করে অভূতপূর্ব ফল পেয়েছেন। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে সেই লেটুস শাক। উদ্ভিদ ঝিল্লির উপর আলট্রাসোনিক বা শব্দোত্তর তরঙ্গ এমনভাবে কাজ করে যাতে জমির সারবস্তু খুব দ্রুত উদ্ভিদের শরীরে ঢুকে পড়ে উদ্ভিদের বাড়বাড়ন্ত ঘটায়। আমাদের সব্জীবাগানে আমি 'আলট্রাসোনিক গান' দিয়ে সেই এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছিলাম। তার ফলাফল তো আপনারা সবাই নিজের চোখেই দেখেছেন। কথা শেষ করে অদ্ভূতভাবে হাসলেন ডঃ রায়।

সব শুনে এতক্ষণে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে মশায়, আমি কিন্তু বাঁধাকপিটা চুরি করিনি। ও বদনামটা যেন আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। বলে হোহো করে হেসে উঠলেন ডঃ রায়। যাহোক ব্যাপারটা এক্ষুণি পাঁচকান করবেন না। আলু, পেঁয়াজটা কেমন হয় দেখে তারপর একদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেই হবে, কি বলেন?

আমি সায় দিলাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ডঃ রায় আলু, পেঁয়াজের চেহারা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলেন না; কারণ হঠাৎ জামাই-এর অসুখের খবর পেয়ে কর্তাগিন্নী দু'জনেই বম্বে চলে গেলেন। শীতের শেষে আলু, পেঁয়াজ তুলে আর একচোট অবাক হলাম। এক একটা আলুর ওজন প্রায় এক কিলোর কাছাকাছি। পেঁয়াজের ওজন গড়ে এক একটা পাঁচশ গ্রাম। ডঃ রায়কে চিঠিতেই সব জানালাম। খুব খুশি হয়ে জবাব দিলেন ডঃ রায় এবং বম্বে থেকে ফিরতে বেশ দেরি হবে সেকথাও চিঠিতেই জানালেন।

ঠিক করেছি ডঃ রায় ফিরলেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকব। শাকসব্জীর এই দুর্মূল্যের বাজারে ডঃ রায়ের এই আলট্রাসোনিক পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারলে একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হবে। এবার ঢ্যাঁড়শ, ডাঁটাশাক, উচ্ছে, লাউ লাগানো হয়েছে এবং এগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে। ডঃ রায় না ফেরা পর্যন্ত সাধারণ সব্জীবাগানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যাহোক একটা সুখবর আছে। করালী আবার বাগানের কাজে হাত লাগিয়েছে। তবে এবার সব্জীর ভাগে আমার বিল্ডিং-এর পড়শীরা যে মোটেই খুশি হবেন না তা আগে থাকতেই বুঝতে পারছি।

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই দানব প্রাণীগুলিই যে মিমিট সম্বন্ধে আমার সব ধারণা এলোমেলো করে দিচ্ছে ক্যাপ্টেন.......
...বসন্ত আর গরম কালের গোড়ায় এই উপগ্রহটি যে পাতায় ভরা থাকে তার নাম দিয়েছিলাম, 'কার্পেটিলিপ'।
আমাদের কলোনীর প্রধান খাদ্যই ছিল ঐ পাতা
এখন তো 'কার্পেটিলিপের' মরশুম
...কিন্তু দেখো, কিছুই নেই, ফাঁকা!
এও তো হতে পারে 'কার্পেটিলিপের' যে সময়টা আপনারা হিসেব করেছিলেন তার চেয়ে কম সময়ের জন্যে ওগুলো হয়
তবে কী কলোনীর সকলে না খেতে পেয়ে মরে গেছে!
আমরা বিবিবিবিকিউরা অতো সহজে মরি না। মনে হয় অন্য কোনো দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে আমাদের কলোনি!
ওদিকে তখন কিজিনটি ঘাঁটি থেকে তল্লাস কারী দল বেরিয়ে পড়েছে। ওরা খুঁজবে সাট্‌ল স্পেসশিপ আর তার যাত্রীদের!
ওদের কি নিয়ে আসবো...
না কি খেয়ে ফেলবো?
কিজিনটি ঘাঁটি থেকে তল্লাস-কারী দল বেরিয়ে পড়লো।
আমি গাড়ির তেলের লাইনটায় গোলমাল করে রেখেছি। খানিকটা সময় আমরা নিশ্চয়ই পাবো।
আমি সাট্‌লের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ক্যাপ্টেন কার্ক এবং অন্যদের আনার ব্যবস্থা করবো এখনই!
DIST. BY ASIA FEATURES
কিন্তু...
আমরা যখন জানি বিবিবিবিকিউদের কলোনি কোথায়–আমরা তো খানিকটা কাজ এগিয়ে রাখতে পারি
তা পারি.. তবে ঐ দানবের জ্ঞান ফিরে আসার আগেই তা করতে হবে!

[চলবে]

যাদুর দেশে টারজান

সব্যসাচী

টারজানের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। যার সাহায্যে সে আরণ্য জন্তুদের সঙ্গে কথা বলে। আশ্চর্য এই, তার সে ভাষা অল্পবিস্তর বোঝেও সকল জানোয়ার। ট্যান্টরকে সেই ভাষাতেই সে সম্বোধন করল যখন, ট্যান্টর তা বুঝল কিনা, কে বলতে পারে? কিন্তু কথা যদিও-বা না-বুঝুক, কথকের মনের ভাবটা সে যে বুঝতে পারলো তাতে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র। সে-মনোভাব এই যে টারজান বন্ধু, সে সাহায্য করতেই চায় ট্যান্টরের, সাহায্য করতেই সে এসেছে।

কিন্তু শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভেজে না! ট্যান্টরের এখন চাই খাদ্য, পানীয়। এই মুহূর্তেই চাই। তা না পেলে, খিদে আর তেষ্টাতেই অত বড় জীবটা মারা যাবে এক্ষুণি। টারজান তা বুঝলো আর তক্ষুণি লেগে গেল ওর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে।

বেশ ভাল খাদ্যই আছে হাতের নাগালে। অন্তহীন বাঁশবন চারদিকে। বাঁশের কোঁড় ট্যান্টরদের অতি উপাদেয় খাদ্য। খাদ্য এবং পানীয় একাধারে, কারণ কোঁড়ের ভিতর জলীয় উপাদান থাকে খুব বেশী পরিমাণে।

বিশাল এক বোঝা কোঁড় কেটে এনে ট্যান্টরের সমুখে নামিয়ে দেবার পরে, টারজান এইবার লেগে গেল ওর মুক্তির চেষ্টায়। খুব কঠিন ব্যাপার। ডোবার ভিতর দিকে, ডাইনে বাঁয়ে সমুখে পিছনে চারটে খাড়া দেয়াল, হাতিটাকে যে-কোনো দিক দিয়ে উপরে তোলা অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়।

তবু এমন অসাধ্য টারজান তার জীবনে অনেকই সাধন করেছে। অস্ত্রের মধ্যে ছোরা আছে আর আছে বল্লমের ফলা। আর এদিকে রয়েছে টারজানের দেহের অমিত শক্তি। এই তিন বস্তুর সাহায্যে সে শুরু করে দিল, ডোবার ভিতর দিকে একটা দেয়ালকে খাড়া থেকে ঢালুতে পরিণত করতে। এতই ঢালু করতে হবে, তা বেয়ে হাতির মতো বিরাট জীবও যেন বেয়ে উঠতে পারে উপরে।

অসম্ভব ব্যাপার, নয়?

কিন্তু অন্য সকলের পক্ষে অসম্ভব হলেও, অসম্ভব নয় টারজানের পক্ষে। পুরো দুটো দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ডোবার ভিতরের চেহারা সে পালটে ফেললে। আগে ছিল চারদিকেই খাড়া দেয়াল। এখন সেই চার দেয়ালের তিনটে সেই খাড়াই রয়েছে, কিন্তু চতুর্থটা পরিণত হয়েছে এমন একটা ঢালু চড়াইয়ে, যা বেয়ে টারজান তো বটেই, ট্যান্টরও অনায়াসে উপরে উঠে যেতে পারে।

এরপর, মাটির হায়না আর আকাশের শকুনকে ক্রুদ্ধ চমৎকৃত করে দিয়ে বন্দী হাতিটা ধীরে ধীরে উঠে পড়ল

একেবারে উপরের মাটিতে। টারজানকে অভিসম্পাত করে আশাহত জীবত্রয় অন্যত্র চলে গেল খাদ্যের সন্ধানে।

কী মহাকায় জীব এই হাতিটা! টারজান এ-জীবনে হাতি দেখেছে হাজার হাজার, কিন্তু সেও অবাক হয়ে গেল এর কলেবর দেখে। তা বলে প্রকান্ড কলেবরই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, মানুষকে আশ্চর্য করে দেবার মতো জিনিস এর ঘটোৎকচ-দেহে আরও আছে। দুটো দাঁতই অতি বৃহৎ এ-হাতির। কিন্তু দুটো ঠিক এক রং নয়, একটা দুধ-সাদা, অন্যটা ঈষৎ কালচে। আকারে যদি সাধারণ মাপেরও হত এই হাতি দুটো দাঁতের এই তারতম্যই তাকে করে তুলত সর্বজনের দর্শনীয়।

গর্ত থেকে উপরে উঠেই ট্যান্টর তার শুঁড় দিয়ে টারজানের সর্বাংগ বুলিয়ে দিল একবার। ঠিক যেন একটা আলিংগনই। টারজানও তার সেই শুঁড়ে করস্পর্শ দিল অনেক আদরে, তারপরে সে যাত্রা করল তার গন্তব্য উত্তর দিকে আবার। ট্যান্টর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল টারজানের সবল মূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারপরে সে ধীরে ধীরে ফিরলো পূবদিকপানে। ঐ দিকেই সে জলের গন্ধ পেয়েছে অনতিদূরে।

টারজান চলেছে একা, সোজা উত্তরে। পল হেন্টরও উত্তরেই চলেছে, তবে একটু পূবদিক দিয়ে ঘুরে। কারণ তার ওয়াজিরি সহচরেরা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল ছানছানু নরখাদকের এলেকায় প্রবেশ না করতে।

আর আলবুর্জ-রীকি? এমরেল্ডাকে নিয়ে তারাও চলেছে উত্তরেই। আলবুর্জ এখনও আশা রাখে যে তার সেই স্বপ্নের দেশ সে পাবেই খুঁজে, রাজা হয়ে বসবে সেখানে এমরেল্ডাকে বিবাহ করে। নকল সবুজমণি এখনও সে সযত্নে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার মণিটাই আসল মণি। তাকে দিয়ে অলৌকিক কাজ যে কিছু করানো যাচ্ছে না, সে শুধু তার আর রীকির অজ্ঞতার দরুন। আর এমরেল্ডার? সে অবশ্য অজ্ঞ নয়, ভাল্লাতে তাকে তো অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে ঐ মণি দিয়েই যাদুর খেল দেখাতে। এখন যে এমরেল্ডা তা দেখাচ্ছে না, সে শুধু আলবুর্জ-রীকিকে জব্দ করার মতলবে।

আলবুর্জ দাঁতে দাঁত ঘষে। এমরেল্ডাকে সে এর শোধ দেবে। একবার স্বপ্নের দেশের রাজাসনে বসতে পারলে হয়।

তিনটি পথ সমান্তরালে চলে গিয়েছে উত্তরে। তিনটিই পথহীন পথ অবশ্য। জন্তু-জানোয়ারেরা চলাচল করেছে যুগযুগ ধরে। শুঁড়ি-শুঁড়ি পথরেখা গজিয়ে উঠেছে মহারণ্যের প্রতি মহল্লায়। গাইড যারা, বনে বনে ঘোরাই পেশা যাদের, তারাই বলতে পারে, কোন পথরেখার পরে অপর কোন পথরেখা ধরলে আনুমানিক কোন অংশে পৌঁছানো যাবে।

সেখানে পৌঁছানোর পরেই বা সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে কোন শ্রেণীর জীবিত প্রাণীর, মহাকপি না মহাসিংহ, গোমাংগানি না টারমাংগানি, বোংগার উপাসক না জন্তুপূজক।

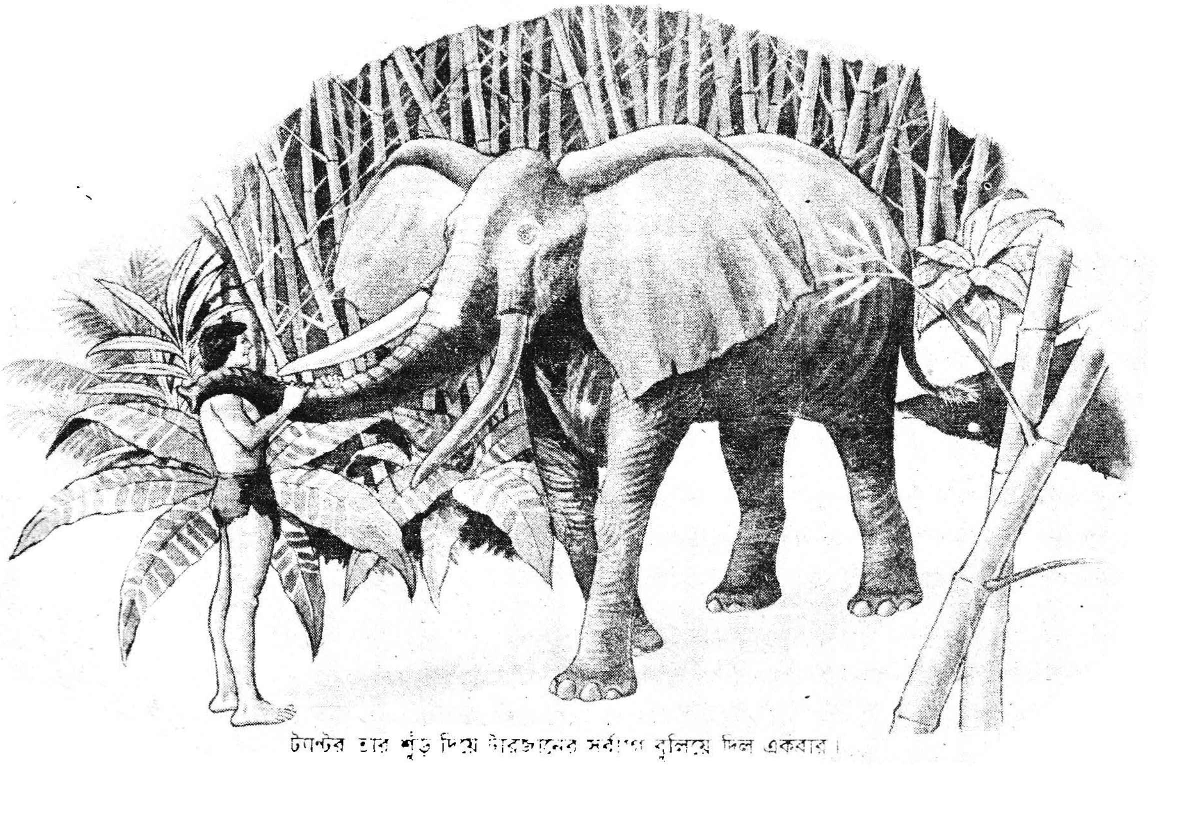

ট্যান্টর তার শুঁড় দিয়ে টারজানের সর্বাংগ বুলিয়ে দিল একবার।

পল হেক্টর চলছিল সর্বপশ্চিম পথরেখাটা ধরে। তার সাফারিতে মাত্র ছয়টা লোক। টারজানেরই খামারের শ্রমিক, প্রয়োজনে বর্শা বল্লম তীর ধনুক রাইফেল রিভলভার সব-কিছুই চালাতে জানে। তাদেরই এক সকালে ডেকে বললো হেক্টর—"ভাই সব! তোমাদের আমি আর বেশীদূর নিয়ে যাব না। এ অরণ্যের শেষ যে কোথায়, শেষ প্রান্তে কি যে আছে, তা তোমরাও জানো না, গাইড বলে যারা আমাদের সাহায্যে আসে মাঝে মাঝে, জানে না তারাও। এ-অবস্থায় আমি আর বলতে পারি না তোমাদের যে চলো তোমরা, আরও আরও অজানা মুলুকে আমার অনুসরণ কর, ঝাঁপিয়ে পড় আরও আরও অনির্দেশ্য বিপদের মুখে। তোমরা ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর খামারে। তাঁর কাছে আমার ঋণের অবধি নেই। সে-ঋণ আরও বেড়ে যাক। এটা আমি চাই না। বিদেশে বিঘোরে মৃত্যুর মুখে তোমাদের আমি আর চাই না ঠেলে দিতে। আমার বোঝা আমাকেই বইতে দাও। তোমরা ফিরে যাও নিজের দেশে।"

টারজানের সৈনিক, তারা প্রভুর বা প্রভুস্থানীয় ব্যক্তির আদেশ নির্বিচারে পালন করতে অভ্যস্ত। তবু তারা বিনীতভাবে খানিকটা তর্ক না-করলো, তা নয়। বোঝাতে চাইল যে একা কেউ এই অরণ্য রাজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হতে পারে না, সহস্রমূর্তি ধারণ করে মৃত্যু তার জন্য ওৎ পেতে আছে প্রতি পদক্ষেপে। বোঝাতে তারা চাইল ঠিকই, কিন্তু জীবনে যে বিতৃষ্ণ হয়েছে, সে যুক্তিতর্কের ধার ধারবে কেন? এমরেল্ডাকে শত্রুহস্ত থেকে উদ্ধার করতে না পেরে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তার পৌরুষগর্বে। সে ওয়াজিরিদের কোনো কথাই শুনল না। তারা অগত্যা বিদায় নিল শুভেচ্ছা জানিয়ে।

তারাও বিদায় নিল, পরদিনই এক মহাবিস্ময় সহসা আত্মপ্রকাশ করল হেক্টরের সমুখে। প্রভাতে বৃক্ষশাখার শয্যায় শুয়েই সে দেখতে পেলো তার পশ্চিম দিকে আর অরণ্যের অস্তিত্ব নেই, তার পরিবর্তে রয়েছে বিস্তীর্ণ এক ধূলিবহুল প্রান্তর। সে-প্রান্তরে দাপাদাপি করে ফিরছে অন্তত দুই চারশো হাতী। আর সেই হাতীর বাহিনীর পশ্চাতে? হাতীর দাঁতে-গড়া প্রাচীরে ঘেরা এক সমৃদ্ধ নগর, সেই প্রাচীরে সশস্ত্র সান্ত্রী ঘুরছে শতশত। আশ্চর্য এই যে তাদের পরিধানে হস্তীদন্তের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ, হাতে পায়েও শুভ্র অংগত্রাণ। সম্ভবতঃ হাতীর দাঁতে তৈরি সে-গুলিও।

মস্ত শহর। হেক্টর বিবেচনা করে দেখল, সাজসজ্জায়, ক্রিয়াকাণ্ডে বেশ একটু অসাধারণ, এমন কি বিদ্ঘুটে বলে মনে হলেও এ-লোকগুলি সভ্যতাবর্জিত নয়। সুতরাং এদের কাছে গিয়ে এমরেল্ডার খোঁজখবর যদি নেওয়া যায়, লাভ তাতে না হোক, লোকসান হওয়ার আশঙ্কা নেই। যারা হাতীর দাঁতের চাদর তৈরি করতে জানে, জানে সেই চাদর দিয়ে বসনভূষণ অলঙ্কার তৈরি করতেও, তারা বিদেশী আগন্তুককে দেখা-মাত্র কোতল করার হুকুম দিয়ে বসবে, এমন তো ভাবাই যায় না। গাছের ডালে বসে শহরটা যত নিকট মনে হয়েছিল, হাঁটতে গিয়ে তত আর মনে হলো না হেক্টরের। যত নিকটবর্তী হয়, ততই হেক্টর লক্ষ্য করে যে নগররক্ষীরাও তার আগমন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। শুধু সচেতন নয়, কৌতূহলীও। এমন কি অনুসন্ধিৎসুও। ঐযে নগরতোরণ খুলে একদল রক্ষী মাঠে বেরিয়ে এল, মাঝপথে তার সংগে মিলিত হওয়ার জন্য।

মহা মুস্কিল, কেউ কারও ভাষা বোঝে না। যতগুলো ইউরোপীয় ভাষা জানা আছে হেক্টরের, একে একে তার প্রত্যেকটার সাহায্যে কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করল সে, কোনো ফল হলো না। তারপর সে আফ্রিকার জংলী জবানগুলির (যতটুকু সে শিখেছে এই মহাদেশে আসার পরে) মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করার চেষ্টায় লেগে গেল। জয় যীশু! এইবারে খানিকটা সফল হলো সে। ওয়াজিরি-জবান কতক কতক বোধগম্য হলো নগরবাসীদের।

হেক্টর এইবার তার সব কথাই খুলে বললো। এমরেল্ডার বর্ণনা দিল, এবং এমরেল্ডা কোনো অজ্ঞাত দস্যুদল কর্তৃক অপহৃতা হওয়ার ফলেই যে হেক্টরকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তার সন্ধান করার জন্য, এ সমস্তই জানালো সান্ত্রীদের। "সে-মেয়েটি কি এসেছে তোমাদের নগরে?"—জিজ্ঞাসা করল সব কথা খুলে বলার পরে।

সান্ত্রীদলের নায়ক লোকটি বেশ ভদ্র। হেক্টর পরে জেনেছিল, নাম তার ভলপোন। সে এমরেল্ডার বর্ণনা শোনার পরে খানিকটা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকল হেক্টরের দিকে, এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল—"তা এসেছে মশাই। শুধু ঐ রকম একটি মেয়ে নয়, তার সংগে দুটো অনামুখো দুর্বৃত্তও। মেয়েটি তো বলেই ফেলেছে যে তাকে জোর করে ধরে এনেছে ঐ জোড়া বদমাইশ, বহুদূরের সেই ওয়াজিরি দেশের সীমান্ত থেকে।"

হেক্টর! বেচারী হেক্টরের যেন দম আটকে আসতে চাইছে উত্তেজনায়। সারা আফ্রিকা পায়ে পায়ে দুরমুশ করে এসে অবশেষে সে এমরেল্ডার পাত্তা পেলো এই সভ্যনগরে। আশা করা যায় যে এখানকার শাসকেরা অতঃপর এমরেল্ডাকে মুক্তি দেবেন।

"ঐ দুর্বৃত্ত দু'টো? আমার খুব সন্দেহ, আলবুর্জ-রীকি ছাড়া অন্য কেউ নয়। কিন্তু ওরা চোর, দস্যু, কী যে নয়, তা বলতে পারব না। যাই হোক, ওদের জন্য আমি আপনাদের দয়া ভিক্ষা করব না। আমি শুধু মুক্তি প্রার্থনা করব ঐ মেয়েটির, ও ইংল্যাণ্ডে যাবে বলে বেরিয়েছিল ভান্দ্রা থেকে। আমিও তখন ভান্দ্রা থেকে ইউরোপে যাচ্ছি, ও আমার সংগ নিল। পথের মাঝে ওকে চুরি করল ঐ দুটো অসৎ লোক। আমি কর্তব্য জ্ঞান করলাম ওর সন্ধানে বেরুবার।"

ভলপোন বলল—"মেয়েটির মুখ থেকেও আমরা ঐ রকম গল্প শুনেছি। তোমার সব কথাই যে সত্য, তাতে আমার

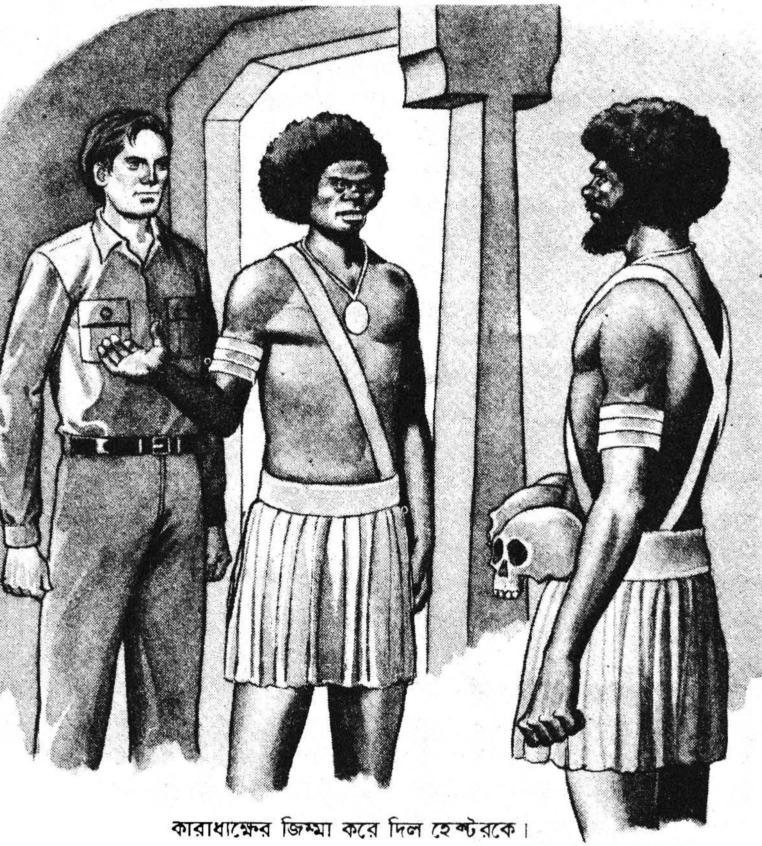

কারাধ্যক্ষের জিম্মা করে দিল হেক্টরকে।

সন্দেহ নেই। আগেকার দিন হলে মেয়েটির বা তোমার মুক্তিলাভে এক দন্ডও দেরি হত না। কিন্তু হালে আমাদের এই দেশের উপর দিয়ে একটা বিপ্লব গড়িয়ে গিয়েছে। রাজা বুথ ছিলেন অতি সৎ লোক। তাঁর আমলে ধর্মরাজ্য ছিল এদেশে। কিন্তু তার একটি বৈমাত্রেয় ভাই, নাম তার নার্শ্ব, হঠাৎ, এই অল্প কয়েকদিন আগে করল বিদ্রোহ। বুথ তৈরি ছিলেন না। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিনি পাহাড়ে পালিয়েছেন। নার্শ্ব এখন সিংহাসনে। সে লোক ভাল নয়—"

হঠাৎ ভলপোনের চৈতন্য হলো যে এভাবে দেশের সমস্ত গোপন কথা একটা অজ্ঞাতপরিচয় বিদেশীর কাছে প্রকাশ করে দেওয়া তার অত্যন্ত অন্যায় কাজ হচ্ছে। সে একদম চুপ করে গেল।

হেক্টর ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"রাজা নার্শ্ব কি আর একটি বিদেশিনী বালিকাকে অকারণে আটকে রাখবেন?"

"বলা যায় না। তবে আটক রাখা বা না-রাখা রাজার মর্জির উপরে নির্ভরও করে না। সে-ব্যাপারে শেষ কথা হলো রাণী মার্গাটির। সত্যি কথা এই যে মেয়েটি এখন আছেও মার্গাটির হেফাজতেই। তাকে যদি বরাবরের জন্য আটক রাখেন, রাণীই রাখবেন। এই মুহূর্তে রাণীর কথার উপরে কথা কইবার সাহস এ-দেশে কারও নেই। কারণ বিদ্রোহটা ঘটিয়েছিলেন ঐ রাণীই। বিদ্রোহী সৈন্যরা এসেছিল রাণীরই বাপের বাড়ির দেশ থেকে।"

কথা কইতে কইতে ওরা সবাই নগরে প্রবেশ করেছে ততক্ষণে। প্রথম দর্শনেই হেক্টরের মনে হলো এ-নগরীর নাম হওয়া উচিত গজদন্তপুরী। প্রত্যেকটা বাড়ি গজদন্তে তৈরি, অপূর্ব কারিগরি সে-সব গৃহ-নির্মাণে। হাতীর দাঁত পিটিয়ে চাদর বা তক্তা বানিয়ে ফেলা, তা দিয়ে আবার কড়ি বরগা গড়ে নেওয়া, টালি তৈরি করা ছাদ পেটানোর জন্য—অপূর্ব সত্যি! চারদিকে চোখ ধাঁধানো সাদা রং। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে প্রত্যেকটা বাড়ি।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে নগরের মাঝামাঝি এসে থামলো ভলপোন তার সান্ত্রীদের নিয়ে—"এইটি রাজার বাড়ি। রাজা নার্শ্বকে তোমার কথা এত্তেলা করে আসি। তোমার সম্বন্ধে রাজার যা হুকুম হয়—"

কথা শেষ না করেই ভলপোন রাজবাড়িতে ঢুকে গেল। পথে আসতে আসতে লোকটার কথায় ছিল কিছু পরিমাণ সহৃদয়তা। কিন্তু হেক্টরের চোখ এড়ায়নি যে নগরে ঢুকবার পরে সেই সহৃদয়তার স্থান ক্রমশঃ অধিকার করেছিল একটা

বিরস কাঠখোট্টাপনা। সম্ভবতঃ এই ভয়ে যে বিদেশীর সঙ্গে মাখামাখি করলে নার্শুরাজার রোষে তার চাকরিটা চলে যেতে পারে।

রাজবাড়ির বিশাল তোরণ, আগাগোড়া গজদন্তের তৈরি। হেক্টরকে নিয়ে সান্ত্রীরা অপেক্ষা করতে থাকল সেই তোরণের বাইরে। হেক্টরের কেনই যেন মনে হতে লাগল, রাস্তার উপরে এই প্রতীক্ষা রীতিমত অসৌজন্যমূলক, রাজার কাছ থেকে হেক্টর সম্পর্কে খুব যে কোনো ভদ্র আদেশ নিয়ে আসতে পারবে ভলপোন, তার ক্ষীণতম আভাসও এ-ব্যবহারের মধ্যে নেই। খুবই অস্বস্তি বোধ করছে তখন হেক্টর।

ভলপোন এল ফিরে। হেক্টরের আশঙ্কা বুঝি সত্য প্রমাণ হতে যাচ্ছে। হেক্টরকে কিছু না বলে ভলপোন কী একটা ইঙ্গিত করল তার সান্ত্রীদের। তারা রাস্তায় নামল আবার হেক্টরকে নিয়ে। অল্পদূরে গিয়েই আর একটা বড় বাড়ি দেখতে পেলো সে। প্রায় রাজবাড়ির মতোই বড়, যদিও সর্ববিধ সৌষ্ঠববর্জিত। বাড়িটার চারিদিকে সান্ত্রীর বাহুল্য দেখে হেক্টরের সন্দেহ হলো। এটা হয়ত কারাগারই হবে বা। এতক্ষণে তার সঙ্গে একটা কথা কইবার সময় হলো ভলপোনের–"বিদেশী ভদ্রলোক, আমি দুঃখিত। কিন্তু রাজার সন্দেহ, তুমি হয়ত পলাতক রাজা বুথের চরও হতে পার। তাই তোমাকে আপাততঃ কারাগারে রাখা হচ্ছে। খোঁজখবর নিয়ে যদি দেখা যায় যে গুপ্তচর তুমি নও, অবশ্যই মুক্তি দেওয়া হবে তোমাকে।"

হেক্টরের বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল যেন, এই কয়েকটি মাত্র কথা শুনে। কোনোরকমে সে একটা মাত্র প্রশ্ন উচ্চারণ করল–"আর সেই যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম–"

"তার কথা সে বলবে। তোমার সঙ্গে যে তার সত্যিকার কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল, তারই তো কোনো প্রমাণ তুমি দাওনি। যা হোক, রাজা তার সম্বন্ধে কোনো হুকুম দেননি। যদি দেন, আর যদি তিনি মনে করেন যে সে-হুকুম তোমাকেও শোনাবার কোনো দরকার আছে, তা হলে অবশ্যই তুমি তা জানতে পারবে।"

ভলপোন আর বাক্যব্যয় করল না। ভিতরে গিয়ে কারাধ্যক্ষের জিম্মা করে দিল হেক্টরকে। সে এক ভ্রূকুটি-কুটিল দাড়িওয়ালা প্রৌঢ়, তার কোমরবন্ধে তিনটে নরকপাল গাঁথা। বস্তুতঃ সারা নগরেই হেক্টর নরকপালের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করেছে এতক্ষণ। কোনোটা শুকিয়ে, মাংস-চামড়ার আবরণ-মুক্ত হয়ে সাদা হটহট করছে গজদন্তেরই মতো। কোনোটা আবার প্রায় কাঁচা রয়েছে এখনো। মাথার চুল এখনও মাথাতেই রয়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে। পরে জেনেছিল হেক্টর, গজদন্তপুরীতে সে-লোক বীর মধ্যেই গণ্য নয়, যার কটিতে শত্রুকপাল দুই একটা গাঁথা নেই। সভ্য দেশে মেডাল বা ক্রশ যতখানি সম্মান পায়, ওখানে নরকপাল তার চেয়ে কম পায় না।

কারাধ্যক্ষ হেক্টরকে গছিয়ে দিল এক মধ্যবয়সী মিতভাষী পুরুষের কাছে–"ম্যাগনোন, তোমার দলে ভর্তি করে নাও একে। যখন যে-কাজে যাবে তোমার দল–"

কারাধ্যক্ষের অনেক কাজ। সে আর দাঁড়ালো না। সেই মধ্যবয়সী পুরুষটি এসে অমায়িকভাবে আলাপ শুরু করে দিল হেক্টরের সঙ্গে। নিজের পরিচয়ও নিজেই দিল–"রাজা বুথের আমলে আমি ছিলাম এ-দেশের বড় আমীর একজন। দেশের লোক আমাকে এতই ভালবাসে যে রাজা বুথকে তাড়াতে সমর্থ হলেও আমাকে বধ করতে সাহস পায়নি রাজা নার্শু। তাই কারাগারে আমাকে রেখেছে আপাততঃ। এটা ওটা দুঃসাহসিক কাজে পাঠায় মাঝে মাঝে, নিশ্চয়ই এই আশায় যে বহিশত্রুর বা হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে আমি অচিরেই একদিন যমালয়ের অতিথি হব।"

ম্যাগনোনের কথা যে কত সত্য, এখন তখনই হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেলো হেক্টর। কারাধ্যক্ষ আবার এল, এবার একটা রাজাদেশ ম্যাগনোনকে শোনাবার জন্য–"নগরোপান্তের অরণ্যে একটা গুণ্ডা দাঁতাল হানা দিয়েছে। পোষা হাতীদের করে তুলেছে অতিষ্ঠ। অতবড় হাতী নাকি এই গজদন্তপুরেও কেউ দেখেনি। তাকে মেরে ফেলার পক্ষপাতী নন রাজা। তিনি চান ওটাকে ধরে এনে পোষ মানাতে। সে-কাজের ভার নেবার মতো সাহসী পুরুষ ম্যাগনোন ছাড়া আর কে আছে? তুমি তৈরি হয়ে নাও। দশটা পোষা হাতী নিয়ে এক্ষুণি তোমায় জঙ্গলের দিকে রওনা হতে হবে। দশটা হাতী আর দশটা মাহুত। এই বিদেশী বন্দী মশাইকেও দলে নিতে পার। মাহুত হিসেবে নয়, শৌখিন শিকারী হিসাবে। বসে বসে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে খেদায় গিয়ে হাতী ধরা অনেক আরামের।"

ম্যাগনোন বাধা দিয়ে বললো–"আরাম? বিপদের কথাটাও বল তা হলে!"

কারাধক্ষ্যের কালো দাড়ির ভিতর থেকে বত্রিশটা সাদা দাঁত ক্ষণিকের জন্য ঝিকমিকিয়ে গেল–"বিপদ? সে তো এই ঘরে বসেও কত লোকের হচ্ছে! রোজই হচ্ছে!"

হেক্টরের দিকে তাকিয়ে ম্যাগনোন বললো এবার–"কী করবে? যাবে? তোমাকে খতম করার মতলবই করেছে নার্শু। হাতীর পায়ের তলায় ফেলেই হোক বা অন্যভাবেই হোক। তুমি তো নিশ্চয়ই আনাড়ি এ-কাজে? আমিও আনাড়ি। তবে দুঃসাহস আমার আছে খানিকটা। মরার ভয় নেই।"

"আমারও নেই। আমি যাব–" বললো হেক্টর।

[চলবে]

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

এরই নাম ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনটি বল বাকি থাকতেই পাকিস্তান জিতে গেল। মাত্র ৩৫টি বল খেলে ৭২ রান করে সেলিম মালিক জিতিয়ে দিলেন পাকিস্তানকে। খেলার শেষে দেখা হতেই পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরান খান বললেন, হারতে হারতে জিতে গেলাম। আর কপিল বললেন, দুটি ওভার আমাদের হারিয়ে দিলো। মনিন্দরের এক ওভারে ১৯ আর কপিলের পরের ওভারে ১৬ রান ভারতের মুঠো থেকে ম্যাচটা বের করে দিলো।

কলকাতায় এর আগে কখনও একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয় নি। টি. ভিতে দেখে আর রেডিওয় শুনে এতোদিন আমরা একদিনের ইনসট্যান্ট ক্রিকেটের আঁচ পেতাম। এবার চোখের সামনে দেখলাম সেই খেলা। সত্যিই একদিনের ক্রিকেট উত্তেজনা, রোমাঞ্চ আর শিহরনে ভরা। টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে এর কোন তুলনাই চলে না। টেস্ট ক্রিকেটের গাম্ভীর্য আলাদা। সেখানে খেলা চলে একটা আলাদা পরিবেশে। ধীরে ধীরে খেলা এগিয়ে যায় মীমাংসার দিকে। অথবা ড্রয়ের পথে। তবে কী যে হবে তা কেউ বলতে পারেন না। অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট তো! কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টেই তো খেলা দুটো দিন গড়াবার পর সকলে ধরে নিয়েছিলেন ড্র হতে চলেছে। কিন্তু তৃতীয় দিন চা পানের পর হঠাৎই বদলে গেলো সব কিছু। রজার বিনি খেলাটিকে টেনে আনলেন নিজেদের অনুকূলে। শেষ পর্যন্ত তুমুল লড়াইয়ের পর ম্যাচ বাঁচিয়ে ফেললেন ইমরান-বাহিনী। তবে খেলার আকর্ষণ বজায় ছিল খেলার শেষ পর্যন্ত। অবশ্য দুই অধিনায়কের সম্মতিতে শেষ চারটি ওভার আর বল করা হয় নি।

একদিনের ক্রিকেট অন্য রকম। সেখানে ড্র বলে কোন কথা নেই। হয় হার, না হয় জিৎ। সব সময় সেখানে উত্তেজনা। তাই একদিনের ক্রিকেটের আকর্ষণ আলাদা। ক্রিকেট যে কতোটা উত্তেজনাপূর্ণ, শিহরন জাগানো, রোমাঞ্চকর তার আঁচ পাওয়া যায় একদিনেই। টেস্ট ক্রিকেটে একদিন দুশ, আড়াইশ, তিনশর বেশি রান হয় না। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে এক একটি দল ৪০/৫০ ওভারেই দুশ আড়াইশ রান তুলে নেয়। দু দল মিলে তোলে চার-পাঁচশ রান। ফলে দর্শকরা প্রতি মুহূর্তেই পেয়ে যান উত্তেজনার খোরাক। তাই একদিনের ক্রিকেট এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ওপরে – ইডেনে সেঞ্চুরি করার পর আজহারউদ্দিন, নিচে – ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার হাতে রজার বিনি এবং পাশে – ইমরানের বল ঘুরিয়ে মারছেন শ্রীকান্ত।

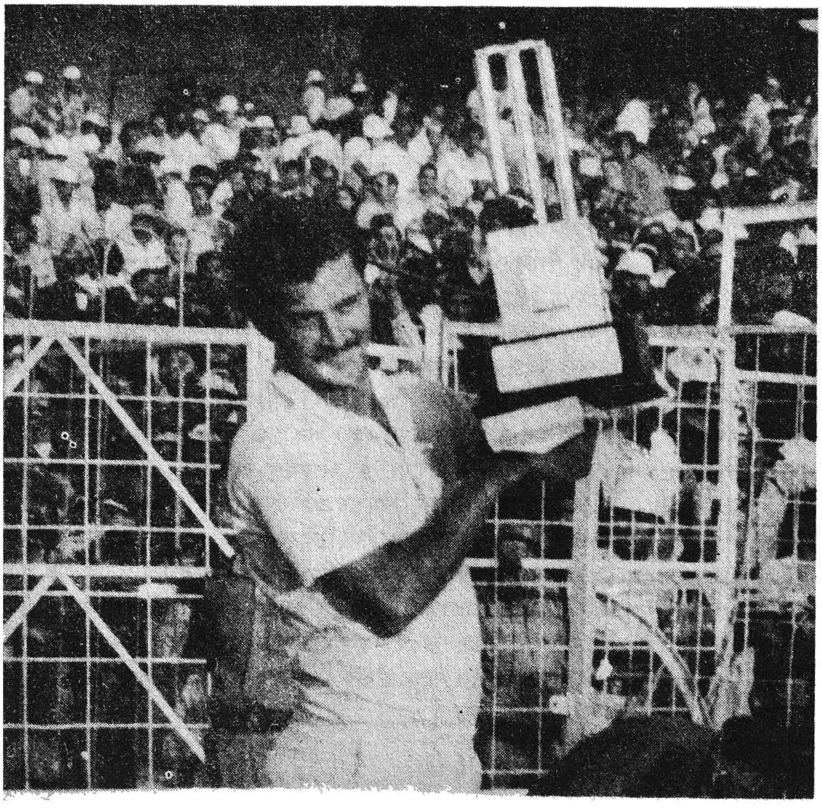

ইডেনে একদিনের ম্যাচের পর সেলিম মালিককে অভিনন্দন

কলকাতাতেই তো ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৪০ ওভারে ২৩৮ রান করেছিলো। এর মধ্যে শ্রীকান্ত একাই করেছিলেন ১২৩ রান। ভারত-পাকিস্তানের একদিনের ক্রিকেটে শ্রীকান্তর আগে কেউ সেঞ্চুরি করেন নি। শ্রীকান্ত দুরন্ত মার মেরে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তাই সকলেই ধরে নিয়েছিলেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হবেন। তাই হতেনও। খেলা শেষ হবার আধঘন্টা আগে ঠিকও ছিলো তাই। কিন্তু আচমকাই সব কিছু বদলে দিলেন সেলিম মালিক। ভারতকে হারিয়ে দিলেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। ৩৫ বলে ৭২ রান করা যে কতো বড় কৃতিত্বের তা তো সকলেই জানেন। বিশেষ করে ভারত যখন ভীষণ ভাবে চেপে ধরে জয়ের খেলা খেলছে। একদিনের ক্রিকেটের মজাই তো ঐখানে। পাকিস্তানকে ঐভাবে জিতিয়ে দেবার জন্য তাই সেলিম মালিকই হয়ে গেলেন কলকাতার প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'। কলকাতার দর্শকদের দুরন্ত একটি সেঞ্চুরি উপহার দিয়েও শ্রীকান্ত পেলেন না ঐ সম্মান। তাতে অবশ্য শ্রীকান্ত মোটেই দুঃখ পান নি। খুশি মনেই সেলিমকে বলেছেন, মাঠের মালিকের মতো খেলেছো বলেই তুমি ঐ পুরস্কার পেলে।

সে যাই হোক, সেদিন ইডেনে কিন্তু আসলে জিতেছে ক্রিকেটই। ক্রিকেট খেলা যে কতোটা শিহরন জাগানো, রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজনা পূর্ণ হতে পারে ১৮ ফেব্রুয়ারির শেষ বিকেলে ইডেনের এক লক্ষ দর্শক তাই দেখেছেন। এরই নাম ক্রিকেট!

কে রাবার পাবে?

মদ্রাজে প্রথম টেস্ট ম্যাচ ড্র করে ভারত আর পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা যখন কলকাতায় এলেন তখন দু দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল দুরকম প্রতিক্রিয়া। সুনীল গাভাসকার কলকাতায় খেলবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের উল্লাস ছিলো সেই কারণেই। গাভাসকার নেই—এইবার তোমাদের দেখে নেবো। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে খানিকটা টেনশান থাকলেও তাঁরা তা পাত্তা দিতে চান নি। কপিল বলেছিলেন, সুনীল নেই জানি তাতে কী হয়েছে—অন্যরা তো আছেন, আমরা কি খেলতে জানি না? সুনীল গাভাসকারের অভাব আমরা বোধ করতেই দেবো না।

হলোও ঠিক তাই। কিন্তু খেলার আগের দিন ইমরানের মুখে দেখেছিলাম চাপা হাসি। ইমরান ভেবেছিলেন, গাভাসকার নেই তাই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। তাই টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে খেলোয়াড়দের বলেছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়ো ভারতীয় খেলোয়াড়দের ওপর।

পরে অবশ্য ইমরান স্বীকার করেছেন, টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে তিনি ভুল করেছেন। প্রায় হারতে বসেছিলেন। কিন্তু ইমরানের মতো খেলোয়াড়ের মুখে ও কথা সাজে না। কারণ একটা পুরো দিন (শেষ ঘন্টার বাধ্যতা মূলক কুড়ি ওভার সহ) আরও খানিকক্ষণ সময় হাতে পেয়েও পাকিস্তান যে জেতার চেষ্টা করবে না—এ কথা কেউ কল্পনাও

রজার বিনিকে জড়িয়ে ধরেছেন কপিলদেব ও শ্রীকান্ত

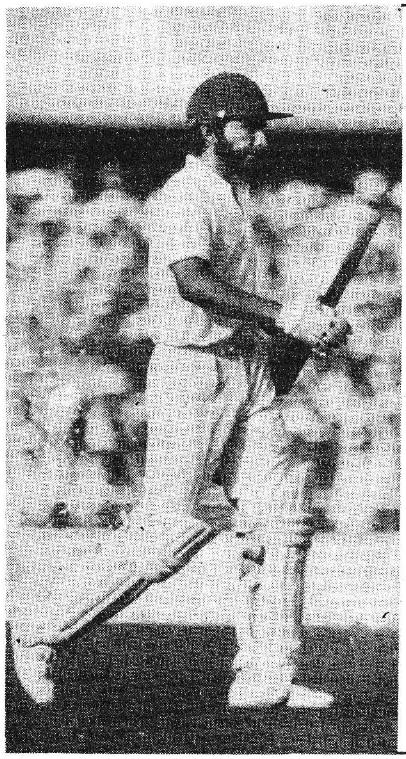

অরুণলাল

করতে পারেন নি। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বর‌্যবর জেতার চেষ্টা করেছে। এবার কিন্তু ইমরান পিছিয়ে গেলেন। আসলে ইমরানের দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই নতুন। অভিজ্ঞতার অভাব তাঁদের বড় বেশি। তাই ইমরান জেতার ঝুঁকি নিতে চান নি। ইমরান জানতেন জিততে হলে তাঁকে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফেলে ছুটতে হবে। ওদিকে কপিল তাঁর দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জেতার জন্যে। ব্যাট বলের সেই লড়াইয়ে অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা কিছুতেই তাল দিতে পারবেন না। তাই ড্রয়ের খেলা খেলার জন্যেই শুধু নির্দেশ নয়–খেলোয়াড়দের একরকম তৈরিই করে নিয়েছিলেন ইমরান। তিনি জানতেন তাঁকে নির্ভর করতে হবে জাভেদ মিয়াদাদের ওপর সব থেকে বেশি করে। তাই করলেন এবং মিয়াদাদও দারুণ খেলে হারা ম্যাচ ড্র করে দিলেন।

বাংলার অরুণলাল চার বছর পরে আবার টেস্ট খেলতে নামলেন। এর আগে তিনি শ্রীলংকা আর পাকিস্তানের সংগে খেলেছেন। করেছিলেন দুবার হাফ সেঞ্চুরি আর একবার ৪০ রান। তবু কিন্তু তিনি আর টেস্ট খেলার সুযোগ পান নি। এবার পেলেন এবং প্রথম ইনিংসে ৫২ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রান করে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে টেস্ট খেলার তাগদ তাঁর আছে।

এই লেখা ছাপা হতে হতে ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট লড়াই শেষ হয়ে যাবে। দেখা যাক কে রাবার পায়।

গল্প হলেও সত্যি

খাওয়া-দাওয়া

কলকাতায় এলেই ক্রিকেট খেলোয়াড়রা খুব মিষ্টি দই খান। এবারও তাই হয়েছে। ভারত আর পাকিস্তানের সাজঘরে সব সময় মিষ্টি দই, নলেন গুড়ের সন্দেশ আর রসগোল্লা মজুত থাকতো। মনিন্দর সিং ঘুরেছেন, ফিরেছেন আর দই খেয়েছেন। কেউ কেউ আবার টিনের রসগোল্লা কিনেছেন বাড়ি নিয়ে যাবেন বলে। পর পর সব খেলা আছে তো–তাই টিনের রসগোল্লা ঠিকই থাকবে। পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা গাদাগাদা ডাব খেয়েছেন। কলকাতার ডাল-ভাত তাঁদের দারুণ লেগেছে। রোজই খেয়েছেন।

আসলে খেলার সময় সাজঘরে আর ডাইনিং রুমে খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা থাকে। যে যতো পারো যা খুশি খাও। সুনীল গাভাসকার কলকাতার মিষ্টি দইয়ের ভক্ত। কলকাতায় যে ক'দিন থাকতেন রোজই তাঁর মিষ্টি দই চাইই চাই। সুনীল আসেননি তাই সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছেন অন্য খেলোয়াড়রা। ক'য়েকজন তো আবার কিছু কিছু বাংলা কথা শিখে গেছেন। একদিন কপিল বললেন, আমি বাংলা জানি, বাংলা বুঝতে পারি। তাই শুনে মনিন্দর সিং বলে উঠলেন, কেন দাদা কচুরী করছেন। মনিন্দর একটু একটু বাংলা জানেন। দিল্লিতে ওঁর নিশ্চয়ই কোনো বাঙালী বন্ধু আছে। তাদের কাছ থেকেই শিখেছেন। তার ওপর এখন তো আবার দলে অরুণলাল আছেন। তিনি বাংলা জানেন। ওঁর বউ বাঙালী।

কলকাতার দর্শক

ইমরান খান বললেন, কলকাতার মতো এমন সমজদার দর্শক সারা পৃথিবীতে তিনি আর কোথাও দেখেন নি। এঁরা যে ক্রিকেট খেলা কতোটা বোঝেন তা তাঁদের আচরণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টেস্ট খেলার সময় দেখেছেন, একদিনের খেলাতেও দেখলেন। ভারত হেরে গেছে, তবু বিজয়ী দল পাকিস্তানকে আর খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সেলিম মালিককে দর্শকরা দারুণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। সারা বিশ্বে এমন উৎসাহ, উদ্দীপনা আর কোথাও দেখা যাবে না। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ–কোথাও না।

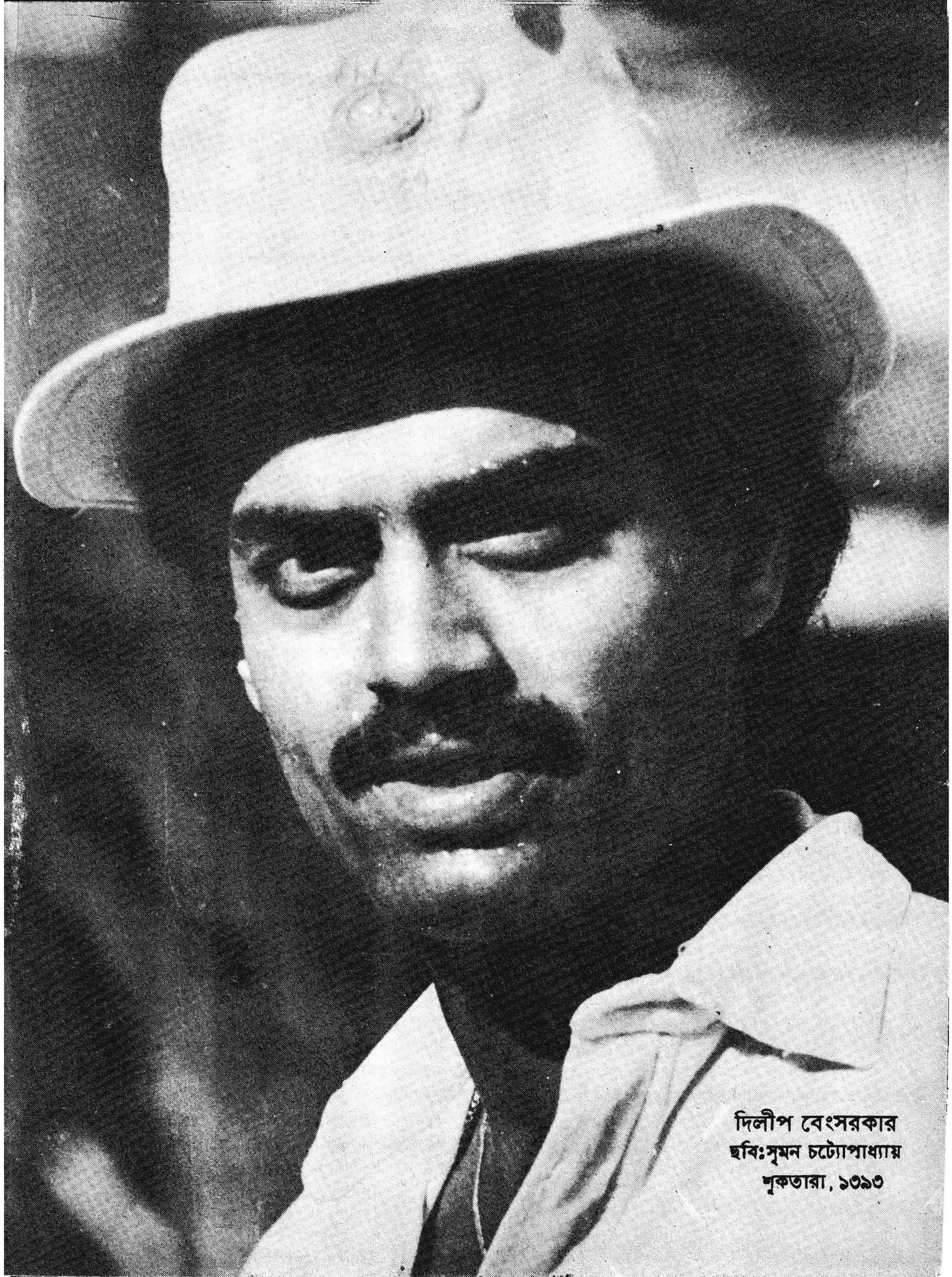

দিলীপ বেংসরকার
ছবি:সুমন চট্টোপাধ্যায়
শুকতারা, ১৩৯৩

ক্রিকেটের লর্ড ক্লাইভ

(একুশ)

১৯৭৫ সাল।
ইংলণ্ডে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতে চলেছে। প্রুডেনসিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। তাদের কোম্পানির নামেই প্রুডেনসিয়াল ট্রফি। বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় ক্রিকেট বিশ্ব এখন মেতে উঠেছে নতুন এক উত্তেজনায়। একদিনের ক্রিকেট যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তার প্রমাণই ঐ বিশ্বকাপ ক্রিকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথমবারই বিশ্বকাপ জেতার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান দল গেলো ইংলণ্ডে। প্রাক্তন অধিনায়ক, বর্ষীয়ান খেলোয়াড় রোহান কানহাইও এলেন খেলতে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকে ছিলো অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন এই বিভাগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে রীতিমত লড়াইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু দেখা গেলো অন্য দৃশ্য। পাকিস্তান প্রায় হারিয়ে দিয়েছিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। একদিনের ক্রিকেটের উত্তেজনায় খেলাটি দারুণ জমে উঠেছিলো। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এজবাস্টনে পাকিস্তানের সংগে খেলতে নামলো।

পাকিস্তান আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ষাট ওভারে করলো ২৬৬ রান। জিততে হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ওভার পিছু পাঁচ রানের মতো করতে হবে। তবে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে নেমেই বিপদে পড়লো। পাকিস্তানি বোলারদের দাপটে মাত্র ১৬৬ রান তুলতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারিয়ে বসলো আটটি উইকেট।

উইকেটরক্ষক ডেরেক মারে তখন লড়ছেন। তাঁর সংগে এসে যোগ দিলেন ভ্যারবার্ন হোল্ডার। হোল্ডার ফাস্ট বোলার। তিনি আর কী করবেন! ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বুঝি হারতেই হবে। জেতার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা তখন দুরন্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মারে আর হোল্ডার দিব্যি তাড়াতাড়ি রান তুলে চললেন। জেতার জন্যে ছটফট করছিলেন পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা। কিন্তু তাঁরা যখন হোল্ডারকে আউট করতে পারলেন তখন জেতার জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দরকার ৬৪ রান।

সকলেই ধরে নিলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে জেতা অসম্ভব। আর এক ফাস্ট বোলার অ্যান্ডি রবার্টস এসে যোগ দিয়েছেন মারের সংগে। মারেকে না পারলেও রবার্টসকে যে কোন মুহূর্তেই আউট করে দিতে পারবেন পাকিস্তানি বোলাররা। ফলে জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হাল ছাড়ার পাত্র ক্যারিবিয়ানরা নন। মারে আর রবার্টস দারুণ খেলতে লাগলেন। গোড়ার দিকে মারে রবার্টসকে আগলাচ্ছিলেন। পরে আর তার দরকার হলো না। দুজনেই মেরে-মেরে খেলতে লাগলেন। ওভারের সংগে রানের ব্যবধান কমতে লাগলো। জয়ের মুখ থেকে হারের দিকে পা বাড়ানোয় পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা ক্ষেপে গেলেন। যেভাবেই হোক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ উইকেটটি ফেলে দিতে চাইলেন তাঁরা। কিন্তু তুমুল সেই উত্তেজনার মধ্যেও মারে আর রবার্টস ঠাণ্ডা মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চললেন। রানের ব্যবধান যতো কমে পাকিস্তানিদের মধ্যে ততোই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ওভারও শেষ হয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে এসে গেলো শেষ ওভার। বল করতে এলেন ওয়াসিম রাজা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে করতে হবে মাত্র দুটি রান। প্রথম দুটি বলে রান হলো না। তৃতীয় বলটি লেগের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মারে আর রবার্টস ছুটতে শুরু করলেন। এক...দু রান... জিতলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরে এসে জিতে গেলো তারা। এ এক দুরন্ত জয়।

পরের খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। সেমিফাইনালে জিতে ফাইনালে উঠলো ঐ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর অস্ট্রেলিয়াই।

ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠালেন। মাত্র ৫০ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারিয়ে বসলো ফ্রেডারিকস, গ্রিনিজ আর

বিশ্বকাপ হাতে ক্লাইভ লয়েড পাশে ডিউক অফ এডিনবরা

কালীচরণের উইকেট। একটু কোণঠাসা অবস্থা। তখনই খেলতে নামলেন অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড। খেলতে নেমেই মারতে শুরু করলেন লয়েড। রান উঠতে লাগলো দ্রুত। দেখতে দেখতে সেঞ্চুরি করে ফেললেন লয়েড। ১০২ রান করে লয়েড যখন আউট হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তখন চার উইকেটে ১৯৯ রান। লয়েডের পর ক্যারিবিয়ান দলের হাল ধরলেন রোহান কানহাই। তাড়াতাড়ি রান তুলে নিয়ে নির্ধারিত ষাট ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করলো আট উইকেটে ২৯১ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগে পাল্লা দিতে পারলো না অস্ট্রেলিয়া। চ্যাপেল ভাইয়েরা—ইয়ান আর গ্রেগ আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া ধারে কাছে পৌঁছুতে পারলো না ক্যারিবিয়ান স্কোরের। জিতলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একদিনের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রুডেনশিয়াল ট্রফি জিতলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। খেলার শেষে প্রিন্স ফিলিপ ক্যারিবিয়ান দলপতি লয়েডের হাতে তুলে দিলেন প্রুডেনসিয়াল ট্রফি। লর্ডস মাঠে কালো কালো মানুষদের মনে সেদিন আনন্দের বান। নেচে, গেয়ে তাঁরা পালন করলেন বিজয় উৎসব।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে। বিশ্বকাপের খেলায় দু দুবার হারালেও দলগত শক্তির দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়া যে কম যায় না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া খেলা ওদের দেশের মাটিতে। তাই লড়াই দারুণ জমে উঠবে। কারণ ইয়ান চ্যাপেলের দল বিশ্বকাপে পরাজয়ের জ্বালা জুড়োতে চায় দেশের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে।

ওদিকে লয়েডের মাসতুতো দাদা—দশ বছরের বড় ল্যান্স গিবস সেবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাচ্ছেন আর এক সম্ভাবনা বুকে চেপে। টেস্ট ক্রিকেটে সবথেকে বেশি উইকেট দখলের নজির গড়তে চান তিনি। ভাঙতে চান ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যানের ৩০৭টি উইকেট দখলের নজির। বিশ্ব রেকর্ড গড়ার জন্যেই ক্যারিবিয়ান নির্বাচকরা গিবসকে দলে নিয়েছেন। আর একবার সুযোগ দিয়েছেন। এবার না পারলে গিবস সে চান্স আর পাবেন না। লয়েডও চান তাঁর দাদা বিশ্ব রেকর্ড ভাঙুন। গড়ুক নতুন নজির।

সদ্য বিশ্বকাপে জয়ের আনন্দে টগবগ করতে করতে ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল গিয়ে হাজির হলো অস্ট্রেলিয়ায়।

[চলবে]

নিবেদন

চিঠি-পত্রের গোলমালের জন্যে নবকল্লোল, শুকতারা এবং দেব সাহিত্য কুটীরের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, এখন থেকে তাঁরা যেন চিঠি লেখার সময় বিভাগ ও পত্রিকার নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করেন। যেমন নবকল্লোলের শারীরিক প্রশ্নোত্তর, বা জ্যোতিষীর দরবার, C/O সম্পাদক, নবকল্লোল, ১১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯, আবার শুকতারার ক্ষেত্রে দাদুমণির চিঠি, মজার পাতা বা তোমাদের জিজ্ঞাসা C/O সম্পাদক, শুকতারা, ১১, ঝামাপুকুর লেন. কলিকাতা-৯। দেব সাহিত্য কুটীরে বইয়ের জন্য বা অন্য কোনো কারণে চিঠি লিখতে হলে লিখবেন—কর্মাধ্যক্ষ, দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

ডাকব্যাক — ডানপিটেদের স্কুলব্যাগ

স্কুলের বাচ্চাদের কাছে
কিছুই যেন টেঁকে না ! আর
সেইজন্যইতো তাদের চাই
ডাকব্যাক স্কুল ব্যাগ । যত
ডানপিটেই হোক না কেন, এই
ব্যাগের মজবুত গড়ন আর
ভেতরের শক্ত লাইনিং সহজে
ছিঁড়বে না । শুধু তাই নয়, এই
ব্যাগ ওয়াটার প্রুফ কাপড়েও
পাওয়া যায় ।

চাই ডাকব্যাক স্কুলব্যাগ
কারণ অন্য ব্যাগের থেকে
আরো অনেক বেশি টেঁকে ।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেড
২৩০এ, এ. জে. সি বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২০

Mileage/BW/2/87

উক্তি

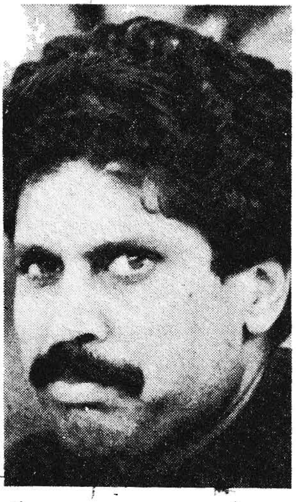

কলকাতার মতো বাজে দর্শক আর কোথাও নেই। ইডেনে আর কোনোদিনই আমি খেলবো না।

সুনীল গাভাসকার

(চার বছর আগে কলকাতায় টেস্ট খেলার সময় বলেছিলেন এ কথা)

ইডেনের দর্শকদের মতো স্পোর্টিং ক্রাউড আর কোথাও দেখিনি। শুধু টেস্ট কেন কলকাতায় আমি লীগ ক্রিকেট খেলতেও রাজি আছি।

কপিলদেব

(কলকাতায় ভারতের সংগে পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হবার আগের দিন সাংবাদিকদের একথা বলেছিলেন কপিলদেব)

ইডেন আমার কাছে শুধু মাঠ নয়—মসজিদের মতো পবিত্র।

মহঃ আজহারউদ্দিন

(ইডেনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি করার পর)

খেলার আগের দিন রাত্রেই কপিল আমায় বলেছিলেন—তুমি খেলছো। শ্রীকান্তের সংগে ওপেন করবে তুমি। কপিলের কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি। তারপর ভীষণ নারভাস হয়ে যাই।

অরুণলাল

(কলকাতায় পাকিস্তানের সংগে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৫২ রান করার পর)

জানি না সুনীলের সংগে কী হয়েছে তবে কলকাতার মতো স্পোর্টিং ক্রাউড খুব কম মাঠেই পাওয়া যায়। এখানে ভালো খেলতে পারলে আলাদাই আনন্দ, আলাদাই তৃপ্তি।

ইমরান খান

(ইডেনে প্রথম টেস্ট আরম্ভের আগের দিন সাংবাদিকদের সংগে কথা বলতে গিয়ে এই কথা বলেন)

অরুণলাল যদি বল মারার বা হিট করার ব্যাপারে আর একটু সতর্ক হয়, তাহলে আমি বলছি ওর ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

আব্দুল হাফিজ কারদার

(পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অরুণলাল ৫২ রান করার পর)

পৃথিবীর বিশেষ কোনো মাঠে দর্শকরা আর টেস্ট খেলা দেখতে আসেন না। ইডেনে আসছেন। কিন্তু এই রকম পিচ বানানো হলে তাঁরা আর বেশিদিন আসবেন বলে মনে হয় না।

মুদস্সর নজর

(ইডেনে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ চলার সময়)

আমার মতে বর্তমান বিশ্বের সেরা লেগ স্পিনার হলো আব্দুল কাদির। ও ভারতের চন্দ্রশেখরের চেয়েও বড় বোলার।

ইমরান খান

(ভারতে খেলতে আসার পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে)

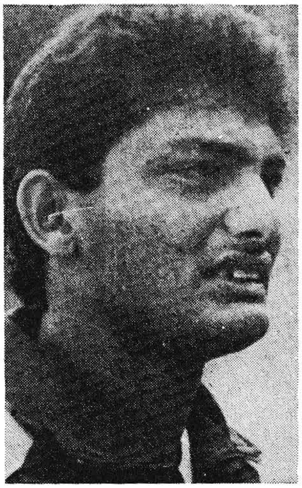

এই সংখ্যার সব ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

পড়ার সঙ্গে খেলা
মধ্যমগ্রাম স্কুল

ফুটবলে বাংলার গর্ব মধ্যমগ্রাম স্কুল, এই স্কুলের ছেলেরা পড়াশুনার সঙ্গে খেলাধূলাতেও সমান উৎসাহী। এই স্কুল ফুটবলেই বেশি গুরুত্ব দেয় বলে জানালেন, গেম টিচার সুশান্ত ভট্টাচার্য। এছাড়া অ্যাথেলেটিক্সে মোটামুটি নাম আছে। ১৯৭৭-এ গোবিন্দ দাস ও ১৯৭৯-এ দীপক পাইন রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হন।

এ পর্যন্ত ৮ বার তারা সুব্রত কাপ ফাইনালে পৌছোয়। এর মধ্যে ১৯৭৯, '৮০, '৮১, '৮২, '৮৩ ও '৮৫ তে চ্যাম্পিয়ন, '৭৮-এ রানার্স আপ। '৮৫, '৮৫-এ সুব্রত কাপ ফাইনালে হারার কারণ হিসাবে সুশান্তবাবু ঠিক মন্তব্য করতে চাইলেন না। শুধু বললেন যে, কলকাতায় আমাদের ছেলেদের পারফমেন্সে আমরা খুবই খুশি ছিলাম। তবুও ফাইনালে কেন হারল তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার ধারণা '৮৫-তে যারা সুব্রত কাপ খেলেছিল তাদের বেশির ভাগ ছেলে '৮৬-এ খেলতে পারেনি, বেশ কিছু নতুন ছেলে নিয়ে এবারের টিম তৈরি হয়েছিল এই একটা কারণ। দ্বিতীয়ত ওরা মাঠে নেমে বেশ নার্ভাস ফিল করছিল। কথাপ্রসংগে সুশান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে কে আপনাদের স্কুলে বেস্ট প্লেয়ার? উনি বললেন, দেখুন প্রতিটি ছেলের অক্লান্ত পরিশ্রমই এই স্কুলের সুব্রত কাপ এনে দেয়। এখানে প্রতিটি ছেলেই ভাল খেলে। তবে Player of the year যারা হয়েছে তাদের ক'জনের নাম আমি বলে দিচ্ছি, ১৯৭৯-তে প্রদীপ সেনগুপ্ত, ১৯৮০-তে সুশান্ত কুন্ডু, ১৯৮১-তে সুশান্ত কুন্ডু, ১৯৮২-তে দীপংকর রায়চৌধুরী, ১৯৮৩-তে মানব দাশ, ১৯৮৪-তে অভিজিৎ রায়চৌধুরী, ১৯৮৫-তে সুরেশ মন্ডল, ১৯৮৬-তে সুনীল গাংগুলী। এবারে ১৯৮৬-তে যারা সুব্রত কাপ খেলেছে তাদের নাম জানতে চাইলে সুশান্তবাবু বললেন, পেয়ারীলাল সিং, অসিত সিং, রাজু গাংগুলী, জামালউদ্দিন সাফুই, পিন্টু বিশ্বাস, অরূপ সাহা, শান্তিরঞ্জন সাহা, দেবশংকর গাংগুলী, সঞ্জয় হাজরা, পুলক রুদ্র, সমীর নন্দী, সুরেশ মন্ডল, প্রসেনজিৎ রায়চৌধুরী, কুনাল কর ও সুরজিৎ ঘোষ।

ফুটবলারদের কি ভাবে অনুশীলন করানো হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে সুশান্তবাবু বললেন, প্রথমে ওদের স্কুল থেকে কোচিং ক্যাম্প আরম্ভ হয়, তারপর এখান, ওখান নানা টুর্নামেন্টে ওদের কিছুটা প্র্যাকটিস হয়ে যায়। ওদের কোচিং-এর জন্য যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরা হলেন প্রবীর বসু, শ্যামল ঘোষ, হেডমাস্টারমশাই কৃষ্ণপদ গাংগুলী ও সুশান্ত ভট্টাচার্য নিজে। কৃতী খেলোয়াড়দের স্কুল অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়। যেমন বই, মাহিনা, যে কোনো মাস্টারমশাই ওদের পড়ান বিনা পারিশ্রমিকে এবং হেডমাস্টারমশাইও যথাসম্ভব সাহায্য করেন। মধ্যমগ্রাম স্কুলেরই ছাত্র শম্ভু বৈদ্য, রাজু গাংগুলী, পুলক রুদ্র জুনিয়র বেংগল ও ইন্ডিয়া জুনিয়রে খেলেছে।

গতবারে অর্থাৎ ১৯৮৫-এ সুব্রত কাপ জয়ের জন্য কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখানে বি.সি.রায় ট্রফির জন্য ওর নিজস্ব গোল ১৩টি এবং ওখানে ফাইনালের গোলটি। এছাড়া ওর মুখেই শোনা যে, ক্যাপ্টেন হওয়াতে ওর একটা আলাদা চাপ পড়ে যায়। ওর দিক দিয়ে ও যতটা সম্ভব ভাল খেলেছে এবং টিমকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই ভার ওর দায়িত্ব বলে ও মনে করে। এছাড়া দলের সহ-খেলোয়াড়রা দারুণভাবে সহায়তা করেছে বলে ও জানায়। এরপর মধ্যমগ্রাম স্কুলের হেডমাস্টার মশাই জানালেন যে, খেলাধূলার সংগে আমরা পড়াশোনার প্রতিও বিশেষ ভাবে নজর দিই। এবারের মাধ্যমিকে শতকরা ৭০ জন পাশ করেছে। এর মধ্যে ৩ জন স্টার এবং ১৫ জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৭০ শতাংশ পাশ করেছে এর মধ্যে ২ জন স্টার, ১৪ জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। এছাড়া বিধান মেলায় যে রচনা প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে তারা প্রথম স্থান পায়।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ

১। ইডেনে ভারত পাকিস্তানের খেলায় ভারতের পক্ষে কে কে সেঞ্চুরি করেছেন ?

২। পাকিস্তানের যে দলটি এবার ভারতে খেলে গেল সেই দলের দুজন খেলোয়াড়ের বাবাও ভারতের বিরুদ্ধে খেলে গেছেন। দুজনেই সেঞ্চুরি করেছেন। সেই দুজন খেলোয়াড় এবং তাঁদের বাবাদের নাম কি ?

৩। ইডেনে ভারত পাকিস্তানের খেলায় প্রথম জুটিতে শতরান করেন কে কে ? কোন সালে ?

৪। ইডেনে ভারত পাকিস্তানের কটি টেস্ট খেলা হয়েছে ? ক'টির মীমাংসা হয়েছে ?

৫। ইডেনে কোন ভারতীয় খেলোয়াড় তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছিলেন ?

৬। ইডেন উদ্যান কার বাগান ছিলো ?

৭। ইডেনে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় কোন সালে কার বিরুদ্ধে ?

৮। এবার ইডেনে এমন একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় এসেছিলেন যিনি ভারত ও পাকিস্তানের–দু দেশের পক্ষেই টেস্ট খেলেছেন। এবার কেন এসেছিলেন ? তাঁর নাম কি ?

৯। ইডেনে আগে প্যাভিলিয়ন কোন দিকে ছিলো ?

১০। ভারত-পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইডেনে শেষ টেস্ট ম্যাচটি খেলেছেন কে ?

উত্তর ঃ

১। দীপক সোধন ১৯৫২-৫৩ সালে। আজহারউদ্দিন ১৯৮৭ সালে।

২। সোয়েব মহম্মদ ও মুদাস্সরনজর। এঁদের বাবা হানিফ মহম্মদ ও নজর মহম্মদ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলে গেছেন। সেঞ্চুরিও করেছেন।

৩। কপিলদেব ও আজহারউদ্দিন–দ্বিতীয় টেস্ট ১৯৮৭।

৪। চারটি। কোনোটিরই মীমাংসা হয়নি।

৫। দীপক সোধন।

৬। লর্ড ইডেনের বোনের।

৭। ১৯৩৪ সালে–ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

৮। আব্দুল হাফিজ কারদার। কারদার সাহেব ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন। এবার এসেছেন পাকিস্তান টি.ভির ভাষ্যকার হিসেবে।

৯। মাঠের পুব দিকে। ভেঙে ফেলা হয়েছে কয়েক বছর আগে।

১০। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক আসিফ ইকবাল।

তোমাদের ? জিজ্ঞাসা

দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায় (হেক্সট অফিসার্স কলোনি, বোম্বাই)

প্রশ্ন: রবি শাস্ত্রী কোথায় কাজ করেন ? নিরলনসে তো ?

উত্তর: না। আগে করতেন। কিছুদিন আগে রবি টাটায় যোগ দিয়েছেন। কাজ করছেন টাটার বোম্বাইয়ের অফিসে।

রণেন ঘোষ (গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা)

প্রশ্ন ঃ প্রসন্নর পুরো নাম কি ?

উত্তর ঃ এরাপল্লি অনন্তরাও শ্রীনিবাস প্রসন্ন

কল্যাণ ও মধুমালা গুপ্ত (যাদবপুর হাই স্কুল)

উত্তর ঃ তোমাদের গড়া শ্রেষ্ঠ বিশ্ব একাদশের খেলোয়াড়দের নাম ছেপে দেওয়া হলো–

ভিভ রিচার্ডস (অধিনায়ক), ইমরাণ খান (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল কাদির, ম্যালকম মার্শল, ডেভিড গাওয়ার, দুঁজো, প্যাটারসন, রিচার্ড হ্যাডলি, ইয়ান বথাম, গর্ডন গ্রিনিজ ও ক্রুস রিড।

তোমাদের দলে ভারতের কেউ নেই কেন ? এঁরা কি ভারতের বিরুদ্ধে খেলবেন ?

ইন্দ্রনীল গাঙ্গুলি (জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলি)

উত্তর ঃ তোমার দুটি প্রশ্নের উত্তর তো ভাই আগেই ছাপা হয়ে গেছে। তাই আবার উত্তর দিলাম না। তুমিও নিশ্চয়ই শুকতারাতেই তোমার উত্তর পেয়ে গেছো তাই না !

ব্রুস লি
ডিভোনো ও ম্যাটেরা
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
শূটিংয়ের তোড়জোড় চলছে। পরিচালক মার্টিন কাকে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় ব্রুস লির চোখ পড়লো শূটিং দেখতে আসা ভিড়ের মধ্যে ফ্রেড হোভির বউ ম্যাগির ওপর। লি ছুটল ম্যাগির দিকে...
ম্যাগি! চলে যেও না!
থামো, থামো ব্রুস! এই দৃশ্যটা আমাদের এক্ষুণি তুলতে হবে!
ও আমায় ধরতে পারলে সব গোলমাল হয়ে যাবে... ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে!
ম্যাগি, ম্যাগি... পালিও না... আমি শুধু জানতে চাই ফ্রেড কোথায়!
বুঝতে পারছি না ব্রুস ঐ মেয়েটার পেছনে ছুটছে কেন! পেট চলো, আমরা ওকে সাহায্য করি।
হুঁ, স্যার ম্যালকম ঠিকই আন্দাজ করেছেন দেখছি! হোভি তাহ'লে এখানেই আছে...
...আর ব্রুসই আমায় ওর কাছে পৌঁছে দেবে!
ওদিকে শূটিং বন্ধ! ব্রুস, বিনি, পেট আর ডন পার্কস ম্যাগির পেছনে ছুটছে। ম্যাগি চেষ্টা করছে দর্শকদের ভিড়ে হারিয়ে যেতে।
আমার সব অভিনেতারাই ছুটছে... শিগ্গির সকলে ক্যামেরা ট্র্যাকে উঠে পড়ো...
আমি এই দৃশ্যটাই তুলতে চাই!!
ইতিমধ্যে...
আমি যদি ম্যাগিকে হারিয়ে ফেলি তাহ'লে কোনদিনই আর ফ্রেডকে খুঁজে পাবো না!

আমি কিছুতেই ক্রুসকে ফ্রেডের কাছে যেতে দিতে পারি না... কিন্তু আমি যাই কোথায় ?
একটু সরুন......
ওঃ.....
আহা ক্রুসের মতো যদি ছুটতে পারতাম! পেট ক্রুসকে আর দেখতে পাচ্ছি না!
আমিও না, ডন পার্কস কিন্তু আমাদের ঠিক পেছনেই.....
জোহানসবার্গের শহরতলীতে ক্রুস ছুটে চলেছে ম্যাগির পেছনে.........
ফ্রেড আর ম্যাগি নিশ্চয়ই আরও বড় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। শার্কের দেনার চেয়েও বড় কিছু!
এই রে, ও যে কাছে এসে পড়েছে!
DIST. BY ASIA FEATURES
ছবি ঠিক তুলতে পারছো তো ?
চিন্তা কোর না মার্টিন, আমি ঠিকই ছবি তুলছি!
আমি প্রায় বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি..... এখানে নিশ্চয়ই ভিড়ে মিশে যেতে পারবো!
SHARMAN DiVONO FRAN MATERA
DIST. BY ASIA FEATURES
দাঁড়াও, দাঁড়াও, ম্যাগি.....!

[চলবে]

অলৌকিক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ছেলেটিকে দেখেই কেমন যেন একটা আনন্দে ভরে উঠল অতিথিদের মন। শুধু রূপ নয়, ছেলেটির ব্যবহারই তাদের কাছে হয়ে উঠল বেশি আকর্ষক। বারবার তারা তাকায় ছেলেটির দিকে।

অতিথিদের ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেটি কিন্তু একটুও ঘাবড়ায় না। সে বুঝতে পারে অতিথিদের বিস্ময় তাকে দেখেই। শুধু এরা কেন, যারা তাকে দেখে তারাই এমনি একটা দমবন্ধ করা বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে যায়। ছেলেটি তা জানে। জানে বলেই দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

ব্রজধাম বৃন্দাবনে তখন শেষ বিকেলের রোদ। গাছপালা ধুলোমাটি নিয়ে বৃন্দাবনের প্রকৃতি তখন যেন সেজে উঠেছে এক অপরূপ সাজে। অস্তাচলে লুকিয়ে পড়ার আগে বৃন্দাবনের ওপর সোনার ঢল নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আকাশের সূর্য। সূর্যের সেই আলো এসে পড়েছে গোবর্ধন পাহাড়ের গুহাতেও। সেই গুহার সামনে দাঁড়িয়েই ছেলেটি এবার বলল স্তব্ধ অতিথিদের—আসুন, আপনারা এবার ভিতরে এসে বসুন।

অতিথিরা বলে, হ্যাঁ বসব তো বটেই। আজ আমরা তোমাদের অতিথি। তোমার বাবা-মাকে ডাকো।

তাঁরা তো এখন বাড়িতে নেই। একটা বিশেষ কাজে গেছেন বাইরে।

গৃহস্বামী বাড়িতে নেই শুনে ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় অতিথির দল। বলে, ও ঘরে যখন কেউ নেই, তখন আমরা বিদায় নিই। যাই অন্য কোথাও?

কেন, ঘরে কেউ থাকবে না কেন? আমি তো আছি।

তুমি? অতিথিদের মুখে ফুটে ওঠে হাসির রেখা। তারা হেসেই বলে, হ্যাঁ, তুমি যে আছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু—

কোনো কিন্তু করবেন না। আপনারা অতিথি। অতিথির সেবা করতে পারলে জীবন ধন্য হবে। তাছাড়া বাবা-মা ফিরে যদি শোনেন অতিথি ফিরে গেছেন গৃহ থেকে, তাহলে তাঁদের আর দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তাই আপনারা দয়া করে ঘরে আসুন। আমি আপনাদের অভ্যর্থনার যথাযথ ব্যবস্থা করব। একবার এসেই দেখুন না।

বছর আটেকের এই সুন্দর ছেলেটির কথাবার্তা শুনে অতিথিরা আর না করতে পারল না। ছেলেটির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল তারা এর আগে, এবার মুগ্ধ হলো তার ব্যবহার এবং কথা শুনেও।

অতিথিরা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি বাছা?

আমার? আমার নাম নিয়ম—নিয়মানন্দ।

নিয়মানন্দ। ভারি সুন্দর তো তোমার নাম। তোমার বাবার নাম কি?

আমার বাবার নাম শ্রীমন অরুণ ঋষি।

তোমার বাবা তাহলে ঋষি?

হ্যাঁ, বানপ্রস্থ নিয়ে তাঁরা বাস করছেন এখানে আমাকে নিয়ে।

অতিথিরা নিয়মের কথা যত শোনে ততই একটা বিচিত্র ধরনের আনন্দে অভিভূত হয়। শুধু কথা বলেই তারা আনন্দে ভরিয়ে নিতে চায় মন। নিয়ম কিন্তু তাতে রাজী নয় মোটেই। তাই কথা বলার মাঝে মাঝেই পা ধোয়ার জল এগিয়ে দেয়—অতিথিদের হাওয়া করে দূর করতে থাকে শ্রান্তি।

নিয়মের অতিথিপরায়ণতায় মন ভরে যায় অতিথিদের। তারা ভাবে—সত্যি এমন ছেলে এখানে বিরল।

নিয়ম তাদের বলে, আপনারা শ্রান্তি জুড়িয়ে নিন—আমি এখুনি আসছি।

অতিথিরা হাত মুখ ধুয়ে যখন সুস্থ হয়ে বসে—আকাশে তখন সূর্যাস্তের লাল আভা। এমন সময় ছেলেটি পাত্রে নানা খাদ্যসম্ভার নিয়ে তা রাখে অতিথিদের সামনে। বলে, আপনাদের জন্য এই সামান্য আয়োজন করেছি—আপনারা গ্রহণ করুন। বাবা-মা ফিরে আসবেন এখুনি। তাঁরা এলে পর অন্য ব্যবস্থা হবে।

অতিথিরা কিন্তু হাত গুটিয়েই বসে থাকে। যদিও তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সারাদিনে একটি দানাও পড়েনি পেটে, তবু সামনে নানা খাদ্যসম্ভার থাকতেও তারা বসে থাকে চুপচাপ। নিয়ম বুঝতে পারে না—তার ত্রুটি কোথায়? সে তাকিয়ে থাকে একটু সময়—তারপর বলে, কী হলো আপনারা খাচ্ছেন না কেন? আমি কি কোনো অপরাধ করে ফেলেছি আপনাদের কাছে। যদি করে থাকি তাহলে আপনারা এবারের মতো ক্ষমা করে দিন—গ্রহণ করুন এই খাদ্য।

নিয়মের ব্যাকুলতায় হেসে ফেলে অতিথিরা। বলে, না, না, তোমার অপরাধ হবে কেন? বরং তোমার ব্যবহারে আমরা তুষ্টই হয়েছি। আমরা প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হোক।

তবে খাবেন না কেন?

শোন বাছা, অতিথিরা বেশ আদর করেই বলে নিয়মকে।

আমরা যতি। সূর্যাস্তের পর আমরা কোনো আহার গ্রহণ করি না। তাই এখন আমরা তোমার দেওয়া কোনো খাবারই খেতে পারব না।

নিয়ম যেন বুঝতে পারে অতিথিদের সমস্যাটা। ওই সঙ্গে নিজে কিন্তু পড়ে বিষম সংকটে। ঘরে অতিথি–তাদের খাদ্যও দেওয়া হয়েছে–অথচ তারা তা গ্রহণ করতে পারবে না–সন্ধ্যা হওয়ায় এ তো বিষম সমস্যা। কেমন করে রক্ষা পাওয়া যায় এ সমস্যা থেকে।

চুপচাপ ভাবতে থাকে নিয়ম। অকস্মাৎ মনে পড়ে যায় তার জন্মের কথা। মা-র মুখ থেকেই শুনেছে সে সব।

দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে বৈদূর্যপত্তন গ্রাম। সেই গ্রামেই থাকতেন অরুণ ঋষি আর তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী দেবী। ব্রাহ্মণ অরুণ ঋষি সবসময় ব্যস্ত থাকেন পূজাপাঠ আর অতিথি-সেবায়। জয়ন্তী দেবীও একাজে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। তাঁদের ব্যবহারে তুষ্ট সবাই।

অরুণ ঋষি এবং জয়ন্তী দেবী গৃহস্থ, আবার গৃহে থেকেও মহাতাপস। গৃহস্থাশ্রমের মর্যাদা বাড়াতেই যেন তাদের এই আশ্রমে বাস। শাস্ত্র-নির্দেশিত পথেই কাটে তাঁদের জীবন। শুধু একটা কাজ বাকি ছিল–পিতৃঋণ শোধ–তাও পূর্ণ হতে চলেছে এখন।

জয়ন্তী দেবী তখন তাঁর বাপের বাড়িতে। এক রাতে দেখলেন, একটা দিব্য জ্যোতি এসে প্রবেশ করল তাঁর শরীরে। তারপরই শুনলেন আকাশবাণী–আমি সুদর্শন–আমি এবার জন্ম নেব তোমার ঘরে।

স্বামী অরুণ ঋষিকে জয়ন্তী দেবী বললেন সব কথা। শুনে আনন্দে ভরে গেল তাঁরও মন। তারই কিছুদিন বাদে নিয়মানন্দর জন্ম।

নিয়মানন্দ কিছুটা বড় হওয়ার পরই অরুণ ঋষি আর জয়ন্তী দেবী বানপ্রস্থ নিলেন। সুদূর দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ দেশ (বর্তমান অন্ধ্র) থেকে তাঁরা চলে এলেন ব্রজধাম বৃন্দাবনে। বাসা বাঁধলেন গোবর্ধন পাহাড়ের এই গুহায়। নিয়ম অনেকবারই শুনেছে এ কাহিনী। আজ অতিথিরা আহার গ্রহণ করছেন না দেখে আবার মনে পড়ে গেল সেই কথা। তাড়াতাড়ি নিয়ম অতিথিদের বলে, আপনারা দয়া করে একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।

অতিথিরা দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বালক নিয়ম। সামনেই ছিল যে নিমগাছ–তার ওপর তরতর করে উঠে গেল সে। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ম আহ্বান করল সুদর্শন চক্রকে–বলল, তুমিই যখন আমি, তখন বিপদ থেকে উদ্ধার কর আমাকে–সূর্য অস্ত গেছে বলে অতিথিরা আহার গ্রহণ করছেন না, তুমি আবির্ভূত হয়ে দূর কর অন্ধকার।

অবাক কান্ড, নিয়মের সেই কথার পরই দিব্যজ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হলো সুদর্শন। শত সূর্যের দীপ্তিতে ভরে গেল গোবর্ধন পাহাড়ের সেই অঞ্চলটা। বিস্মিত, বিমুগ্ধ অতিথিরা দেখে, গাছ থেকে নেমে আসছে নিয়ম। কাছে এসে নিয়ম বলে, সূর্য তো এখনও অস্ত যায়নি–ওই দেখুন–কেমন রোদে ঝলমল করছে চারিদিক। এবার আপনারা খাবার খান।

অতিথিরা খাবেন কি? তাদের মুখ থেকে তখন একটি শব্দও বেরুচ্ছে না। যে ঘটনা তারা আজ দেখল–তা কোনো মানবশিশুর পক্ষে করা সম্ভব নয়–অথচ তাদের চোখের সামনেই নিয়ম আজ অস্তাচলে যাওয়া সূর্যকে আবার দাঁড় করাল আকাশের বুকে। এ ছেলে তো কোনো সাধারণ ছেলে নয়–এ নিশ্চয়ই কোনো দেবতা অথবা দেবী অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এর অনুরোধ এখন আর সেইসব যতি অতিথির কাছে অনুরোধ নয়–আদেশ। তারা এবার সবকিছুই দেবতার করুণা ভেবে পরম আনন্দে খাওয়া শুরু করল।

খাওয়া-দাওয়ার পর তারা বলে গেল, আজ আমরা যা দেখলাম তার কোনো তুলনা নেই। নিয়ম, আমরা বুঝতে পারছি, তুমি সাধারণ শিশু নও। তুমি যেই হও–মানুষ যখন এবং বালকও তখন তোমাকে আমরা আশীর্বাদ করতে সাহসী না হলেও সহর্ষ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ নিম্ব বা নিমগাছে উঠে তুমি যে দৈব মায়ার সৃষ্টি করলে তার জন্য আমরা তোমার নিয়মানন্দ নামের সঙ্গে দিচ্ছি আরেকটি নতুন নাম–নিম্বার্ক। এই নামেই তুমি একদিন হবে জগৎখ্যাত।

তুষ্ট অতিথিরা সেদিন পরম আনন্দে নিয়মকে তাদের নতুন দেওয়া নামের বালক নিম্বার্ককে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিল।

সেদিন নিয়মের নাম বদল করে অতিথিরা যে কথা বলেছিল–তাই কিন্তু সত্যি হলো একদিন। ভারতের ধর্মজগতে নিয়ম হলেন নিম্বার্কাচার্য। শঙ্করাচার্যেরও অনেক আগে তাঁর জন্ম বলে মনে করেন অনেকে। বেদান্ত দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হলেন তিনি। তাঁর দর্শন জগতে পরিচিত নিম্বার্ক দর্শন নামে। আজও সেই দর্শনের পথে বহু মানুষ করে চলেছেন সাধনা। রামদাস কাঠিয়া বাবা ছিলেন নিম্বার্কপন্থী। সেই দর্শনে এই কিছুদিন আগে তিনি লাভ করেছিলেন সিদ্ধি। আরো বহু সাধক এবং দার্শনিক এই নিম্বার্ক দর্শনকেই করেছেন এবং করছেন জীবনের ধ্রুবতারা।

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সে রাতে অনেক ভাবনা চিন্তার পর সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবলু সাইকেলটা নিয়ে ছুটল প্যাসিদের বাড়ি। গিয়ে দেখল বাড়ি সেই আগের মতোই তালাবন্ধ।

এক ভদ্রলোক বাজার যাচ্ছিলেন। বাবলু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা এরা কোথায় গেছে বলতে পারেন? কাল এই বাড়ির একটি মেয়ে চুরি হয়ে গেল। তাই খবর নিতে এসেছি।

ভদ্রলোক দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—না, কোনো খবর নেই। আর তালাবন্ধ যখন, তখন নিশ্চয়ই কোথাও গেছে। শুনেছি বউমার বাপের বাড়ি ঝাঁঝায়। হয়তো সেখানেই গেছে।

—ঝাঁঝায় কোনখানে বলতে পারেন?

—তা কি করে জানব? ওঁর বাবা স্টেশন মাস্টার। স্টেশনেই খোঁজ নিতে পারো।

—কি নাম বলুন তো?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—পাড়াসুদ্ধু লোকের আত্মীয়-স্বজনদের নাম কি কেউ বলতে পারে? বলে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন।

বাবলুও চলে এলো ভোম্বলদের বাড়ি। তারপর ওকে নিয়ে বিলুকে ডাকল।

বিলু এলে বাবলু বলল—শোন, আমাদের আজই একবার ঝাঁঝায় যেতে হচ্ছে।

—আজই?

—হ্যাঁ, এখুনি।

—তাতে লাভ?

—লাভ-লোকসানের হিসেব পরে করব। তবে আমার মনে হয় ঝাঁঝায় গিয়ে কুসুমকে এবং বউদিকে চাপ দিলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অপহরণের নেপথ্যে ঐ বউদি ছাড়া আর কেউ নেই। সতীনের মেয়ে বলে প্যাসিকে উনি সহ্য করতে পারতেন না। তার ওপর নিঃসন্তান কোনো পরিবারের সঙ্গে চেনা পরিচয় হয়েছে। তাই স্বামীর অনুপস্থিতিতে মোটা টাকার বিনিময়ে অথবা অন্য কিছুর লোভে পাচার করে দিয়েছেন। তবে বিলু, আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে কিন্তু আমি ওদের সহজে ছাড়ব না।

—বাবলু!

—এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। মনে করেছে পালিয়ে গিয়ে রেহাই পাবে, তা হচ্ছে না।

—কখন যাবি?

—এখনই। দশটা দশের তুফানে। আপাততঃ আমাদের তিনজনকেই যেতে হচ্ছে।

বিলু বলল—তোকে দেখে বুঝতে পারছি তুই খুবই উত্তেজিত হয়েছিস। তবে ভাঙা দল নিয়ে আমরা কখনো কোথাও যাইনি এবারও যাবো না। আজ সন্ধ্যের সময় বাচ্চু বিচ্ছুকে আসতে দে। তারপর কাল সকালে যে গাড়িতে বলবি সেই গাড়িতেই যাবো।

বাবলু বলল—বিলু তুই বুঝছিস না, এটা আমাদের পিকনিক অভিযান নয়।

এতক্ষণে ভোম্বল কথা বলল—হোক। তবুও আমার মনে হয়, বাচ্চু বিচ্ছুকে না নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

বাবলু কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে বলল—এক্ষেত্রে সকলের যাবার সত্যিই কোনো দরকার নেই। শুধুমাত্র একটু খোঁজ-খবর নেবার জন্য ঝাঁঝায় যাবো। আমি একাই যাবো। তোরা এখানে

রেডি থাকবি। যদি বুঝি ট্রাঙ্ককলে ডাকব তোদের। তোরা দলবল পঞ্চুকে নিয়ে যাবি।

বিলু বলল–সেই ভালো। তবে তুই একা নয়, তোর সংগে আমিও যাবো। এখন আটটা বাজে। কাজেই তুফানের আশা ছাড়। রাতের গাড়িতে যাবো। ইতিমধ্যে সন্ধ্যেবেলা বাচ্চু বিচ্ছু এসে পড়লে ওরাও জেনে যাবে ব্যাপারটা। তারপর আমরা যদি বুঝি ওখান থেকে তার করব ওদের।

বাবলু বলল–এ যুক্তি মন্দ নয়। তোদের বাড়িতে টাইম-টেবল আছে?

–আছে।

বিলু সংগে সংগে ঘর থেকে রেলের একটা টাইম-টেবল এনে দেখতে লাগল। মিথিলা, নর্থ-বিহার, গোরক্ষপুর, জনতা, দিল্লি এক্সপ্রেস অনেক গাড়ি। দেখতে দেখতে বিলু বলল, এই আজ শুক্রবার না? খুব ভালো গাড়ি আছে একটা। আশা করি ভিড় খুব কম হবে।

–কি গাড়ি?

–উইকলি নর্থ-বিহার। রাত এগারোটায় ছাড়ে।

ভোম্বল বলল–নর্থ-বিহারে ভিড় কম হবে? এমন দুঃস্বপ্ন দেখিস না বাবা। যদি তাই ঠিক করিস তাহলে এখুনি হাওড়ায় গিয়ে তিনটে বার্থের চেষ্টা দেখ।

–তিনটে কেন?

–আমিও যাবো।

বাবলু বলল–তা হয় না ভোম্বল। সবাই চলে গেলে কি করে হবে? যদি বাচ্চু বিচ্ছু আর পঞ্চুকে দরকার হয় তখন কে নিতে আসবে ওদের?

ভোম্বল বলল–ওরে বাবা। পঞ্চু ম্যানেজ আমার দ্বারা হবে না।

–না হবার কি আছে? টিকিট কাটবি ট্রেনে তুলবি। তাতে অসুবিধে বুঝিস প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে নিবি একটা। যত টাকা লাগে লাগবে। আমরা ফিরে এসে দিয়ে দেবো।

ভোম্বলের মুখে হাসি ফুটল এবার।

বাবলু ঘরে এসে টাকা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে চলে গেল টিকিট কাটতে। ভাগ্যক্রমে বিনা মেহনতে দুটো সাইড লোয়ার আপার বার্থই পেয়ে গেল ও।

রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাবলু আর বিলু যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছল প্লাটফরমগুলো তখন খাঁ খাঁ করছে। দুটি একটি লোক্যাল ট্রেন মাঝে মধ্যে আসছে যাচ্ছে কিন্তু লোকজনের ভিড় বেশি নেই। বিশেষ করে আট নম্বর প্লাটফরম তো একেবারেই ফাঁকা। ব্যাপার কি? সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা হয়ে গেল অথচ এখনো ট্রেনের দেখা নেই কেন?

হানটান করতে করতেই ট্রেন এসে গেল। বিশাল গাড়ি। অনেকগুলো বগি। সবই প্রায় থ্রি-টায়ার।

বাবলু বলল–ওরে বাবা। এ যে দেখছি ভূতুড়ে গাড়ি।

বিলু বলল–এত বড় গাড়ি। কিন্তু প্যাসেঞ্জার কই?

–কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার তো।

একটু পরে রেলের একজন খালাসী এসে রিজার্ভেশন চার্ট টাঙিয়ে দিয়ে গেল। চার্ট দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। এ কিরকম হলো! নাম কই ওদের? শুধু ওদের কেন, কোনো চার্টে কারো নামই তো নেই।

দুজন নন-বেঙ্গলি ভদ্রলোক বললেন–এ ক্যায়সা তামাশা হো রহে ভাই?

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি চার্টে নাম পাওয়া গেল। কোচ নাম্বার ফিফটিন। তাইতে মাত্র চারজনের নাম। বাবুল, বিলু এবং ঐ ভদ্রলোক দুজনের।

মুশকিল ব্যাপার। এত বড় গাড়ি অথচ কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। যতগুলো 'কোচ' সবেতেই রিজার্ভেশন নিল। একটি বগীতে মাত্র চারজন। এভাবে কি যাওয়া যায়? বিনা রিজার্ভেশনের যাত্রী জনা পনেরো ছিল। তারা তো ফাঁকা গাড়ি পেয়ে আহ্লাদে নাচতে নাচতে একটি থ্রি-টায়ার বগীতে উঠে শুয়ে পড়ল।

নন-বেঙ্গলি দুজন বাবুলকে জিজ্ঞেস করলেন–কাঁহা যাওগে ভাই সব?

বাবলু বলল–ঝাঁঝা। আপ লোক?

–সমস্তিপুর। লেকিন এহি ট্রেন পর ক্যায়সে যাউংগা? ডাকাইতি হো জায়েগা।

–তাহলে কি করবেন?

–টিকট বিক্ দেগা। কাল সবেরে সমস্তিপুর পাসিনজার পাকড়েগা হাম। বলে চলে গেলেন তারা।

বিলু বলল–কি করবি রে বাবলু? এই অবস্থায় যাবি? ভেবে দেখ।

বাবলু বলল–ভাবাভাবির কিছু নেই। জয় দুর্গা বলে উঠে তো পড়ি। তারপর যা আছে কপালে তাই হবে। যন্তর আমারও রেডি।

–তা না হয় হলো। কিন্তু রাত দুপুরে যদি দশ বারোজন ওঠে তখন?

–যাদের মাথা খারাপ হবে এই ফাঁকা গাড়িতে ডাকাতি করতে তারাই উঠবে, বুঝলি?

যাই হোক, বাবলু বিলু ট্রেনে উঠে ওদের নিজস্ব বার্থ খুঁজে নিল।

বাবলু বলল–আমার জীবনে এই প্রথম ট্রেন ভ্রমণ যে একটি বিশাল বগীতে মাত্র দুজন যাত্রী।

এমন সময় ওরা দেখল একজন শক্তসমর্থ গোছের অবাঙালি যুবক ওদের কামরায় উঠে লেডিজ কূপে ঢুকে লোয়ার বার্থে শোবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগল।

বাবলু বলল–আপনি কোথায় যাবেন দাদা?

–জসিডি।

—আপনার রিজার্ভেশন আছে ?

—এই ট্রেনে কেউ রিজার্ভেশন করে ? তোমরা করিয়েছো নাকি ?

—হ্যাঁ।

—টাকা বেশি হয়েছে নিশ্চয়ই তোমাদের।

—এই রকম ফাঁকা গাড়ি আমরা জীবনে দেখিনি দাদা। এমন কি বিনা প্যাসেঞ্জারে ট্রেন চলে তাও কখনো শুনিনি। আজকের এই ট্রেনটা এখুনি বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।

যুবক বললেন—তোমরা এক কাজ করো, দুজনেই সাইড লোয়ার আপার ছেড়ে এই 'কূপের' ভেতর ঢুকে পড়ো। বাইরের দরজাগুলো সব ভেতর থেকে এঁটে কূপের ভেতরে লক করে দাও। বাথরুম সারবার দরকার থাকে তো সেরে নাও এইবেলা। রাত এগারোটা বাজে। চুপচাপ শুয়ে পড়ো। সারা রাতে কেউ হাজার ধাক্কাধাক্কি করলেও একদম এর ভেতর থেকে বেরিও না।

এমন সময় দুজন আর. পি. এফ. সহ একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে ঢুকলেন ভেতরে—এই বগীতে কে কে আছেন ভাই ?

বাবলু বলল—আমরা তিনজন।

—আপনারা মাল-পত্তর নিয়ে পাশের চোদ্দ নম্বর কোচে চলে আসুন। আমরা সব বগী থেকে লোক টেনে নিয়ে একটা বগীতে জড় করছি। নাহলে এত ফাঁকা গাড়িতে এক আধজন করে থাকা ঠিক নয়। বিশেষ করে আসানসোলের পর এই গাড়ির চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়।

বাবলুরা তাই করতে যাচ্ছিল।

বাধা দিলেন যুবক—আরে ঘাবড়াও মাৎ। আমি জেসিডির বুকিং ক্লার্ক। এই গাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করি। কোনো ভয় নেই। এই কূপ ভেঙে কে ঢুকবে ?

কোচ অ্যাটেনডেন্ট বললেন—যেতে পারেন যান। তবে আমাদের কর্তব্য সাবধান করে দেওয়া, তাই করে গেলাম। এবার যে যা ভালো বোঝেন তাই করুন।

বাবলুরা আর কিছু ভাবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আর. পি. এফ. এবং কোচ অ্যাটেনডেন্টরা নেমে যেতেই যুবকটি সব দরজাগুলো এঁটে বাবলু বিলুকে নিয়ে কূপে ঢুকে দরজায় লক করে দিলেন।

বাবলু বিলুকে বলল—গাড়ির এই রকম অবস্থা বলেই সকালে আসা মাত্র রিজার্ভেশন পেয়ে গেছি।

যুবক বললেন—আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমরা এই গাড়িতে আসবার জন্যে বার্থ রিজার্ভ করতে গেলে কোন দুঃখে। যাক, রাত হয়েছে এখন শুয়ে পড়ো।

বাবলু বলল— জানলে কি করতাম দাদা। এই গাড়িতে এই প্রথম এবং এই শেষ।

নিচের বার্থের একদিকে যুবক এবং একদিকে বিলু শুয়ে পড়ল। বাবলু শুলো আপার বার্থে।

আচ্ছা এরা কোথায় গেছে বলতে পারেন ?

ট্রেন ছুটছে। রাতের ঘন অন্ধকারের বুক চিরে সাঁ সাঁ করে। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম যেন নেমে আসছে দু'চোখের পাতা জুড়ে। বাবলু আড় চোখে দেখল বিলু বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ কি যেন মনে হতেই ঘুম মাথায় উঠে গেল বাবলুর। তাই তো, রেলের পুলিশ এবং কোচ অ্যাটেনডেন্ট যখন সাবধান করে দিতে এলেন তখন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজনের কথায় বিশ্বাস করে ওদের থেকে যাওয়াটা কি ঠিক হলো? বিশেষ করে এই রাতের গাড়িতে? কে বলতে পারে এই যুবকই একজন ক্রিমিন্যাল নয়? গভীর রাতে এই নির্জন কামরায় ওদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে এই লোকটিই যে ওদের গলা কেটে টাকা পয়সা চোট করে দিয়ে পালাবে না তা কে বলতে পারে?

কথাটা মনে হতেই বাবলুর বুকটা কেঁপে উঠল। আর তো ঘুমোলে চলবে না। পিস্তলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথার কাছে রেখে দিল। আজ এই মুহূর্তে বড় বেশি করে মনে পড়ল পঞ্চুর কথা। আসলে এবারের এই অনুসন্ধানে প্রয়োজন নেই মনে করেই পঞ্চুকে আনা হয়নি। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতি ঘটবে জানলে ও নিশ্চয়ই নিয়ে আসত তাকে। তার পঞ্চু সংগে থাকলে নির্ভাবনায় ঘুমোতে পারত বাবলু। কিন্তু এখন আর তো সম্ভব নয়। সারারাত জেগেই থাকতে হবে ওকে। একবার ভাবল বর্ধমান এলে ট্রেন থামলে বগীটা পাল্টে নেবে ও। চোদ্দ নম্বর কোচে পুলিশ প্রহরার মধ্যেই চলে যাবে ওরা। কিন্তু তারপরই অন্য মতলব এলো মাথায়। বার্থের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বাবলু দেখল যুবকটি পাজামা আর গেঞ্জি পরে হাওয়া বালিশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে নাকও ডাকছে ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ করে।

বাবলু ধীরে ধীরে হুকে ঝুলিয়ে রাখা যুবকের পাঞ্জাবিটি তুলে নিল। তারপর আস্তে আস্তে করে চামড়ার অ্যাটাচিটাও তুলে নিল নিজের কাছে। জামার বুক পকেটে হাত লাগিয়ে কিছু কাগজপত্তরের সংগে একটি কার্ড পাসও আবিষ্কার করল বাবলু। না। বাবলুর ধারণাটাই ভুল।

এই তো ফটোসহ পাস রয়েছে বেচারির। পরিচয় মিথ্যে নয়। তবুও একবার ব্যাগটা চেন টেনে খুলে দেখল। না, রিভলভার পিস্তল ছোরা ছুরি কিচ্ছুটি নেই। বাবুল নিশ্চিন্ত হলো। জিনিসগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল সে।

খুব ভোরে বিলুর ডাকে ঘুম ভাঙল। বিলু তখন সেই যুবককে ডাকাডাকি করছে—এই যে দাদা, উঠবেন না? আপনি যে বললেন জসিডিতে নামব? এই তো আপনার জসিডি এসে গেছে। নামুন।

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে বিলুকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে গেলেন ট্রেন থেকে।

একজন চা-অলা কর্কশ গলায় হেঁকে হেঁকে চা বিক্রি করছিল।

বাবলুরা দু'কাপ চা কিনে খেতে লাগল।

ট্রেন ছাড়ল একটু পরেই।

জসিডি থেকে ট্রেনটি ছেড়েই পাহাড় ও বনভূমির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে লাগল। এই অঞ্চলের বন ও পাহাড়ের সৌন্দর্য অতি মনোরম। বিশেষ করে শিমূলতলা ও ঝাঁঝার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের যে বন পাহাড় তার শোভা এখনো চমৎকার। শিমূলতলায় ট্রেন থামল না। বনভূমি কাঁপিয়ে ঝাঁঝার দিকে ছুটে চলল ট্রেন।

ঝাঁঝায় যখন ট্রেন থামল তখন সকাল হয়ে গেছে। ওরা ট্রেন থেকে নেমেই স্টেশন মাস্টারের ঘর দেখতে চলল। বড় স্টেশন। কিন্তু খুব একটা জমজমাট নয়। পাশেই একটি গাছপালাহীন বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে আছে। এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে ওরা স্টেশন মাস্টারের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু একি! স্টেশন মাস্টারের নাম লেখা ফলকটার দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল। এতে যে নাম লেখা আছে তা একজন অবাঙালীর। এমন কি এ. এস. এম. ও তাই। যাঃ। এতদূর আসাই বৃথা হয়ে গেল!

বাবলু বলল—এঃ এমন বোকামি করলাম না, নাম টাম না জেনেই চলে এলাম। ভাগ্যিস দলবল সবাইকে টেনে আনিনি।

বিলু বলল—বোকামো কেন হবে? খোঁজ-খবর এই ভাবেই করতে হয়।

—তাহলে উপায়?

—আগে চল কোথাও গিয়ে পেট ভরে কিছু খেয়ে নিই। তারপরে ভেবেচিন্তে উপায় বার করা যাবে।

ওরা ওভার ব্রিজ পেরিয়ে প্লাটফরমের বাইরে এলো। স্টেশন এলাকাটা খুবই অপরিষ্কার। জমজমাটও নয়। লোক-বসতিও খুব একটা বেশি আছে বলে মনে হলো না। তবে সিঙাড়া কচুরি এবং চায়ের দোকানের অভাব নেই। এমনিই একটি দোকান দেখে বসে পড়ল ওরা। দুজনে চারটে করে কচুরি আর দুটো করে প্যাঁড়ার অর্ডার দিল। সব শেষে ঐ চা এক কাপ করে।

খাওয়া হলে দাম দেবে বলে পকেটে হাত দিচ্ছে তেমন সময় গজকচ্ছপের মতো দীর্ঘদেহ একটি মাংসের তাল পচর পচর করে পান চিবোতে চিবোতে ওদের সামনে এসে বলল—বিশ রূপাইয়া পঁয়ষট্ পইসা হুয়া তুমহারা।

বাবলুর তো মাথা গেল গরম হয়ে—তার মানে?

বিলু বলল—বিশ রূপিয়া কিসে হয়রে ব্যাটা?

বাবলু চোখ টিপে বিলুকে বলল—এই, ব্যাটা ফ্যাটা বলিস না। এরা ভালো বাংলা বোঝে। বুঝতে পারলে রেগে যাবে।

এই হলো দোকানের মালিক। বাবলুদের দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল।

বিলু বলল—পকেট মারবার জায়গা পাওনি? তোমার কচুরি কত করে?

—রোপিয়ামে দো।

—আমরা চারটে করে আটটা খেয়েছি। কত হয়?

–চার রূপাইয়া।

–আর ঐ ছাতুর প্যাঁড়া?

–এক এক রূপাইয়া কা।

–তাহলে চার আর চারে আট টাকা হয়। চা কত করে?

পিস্তলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে মাথার কাছে রেখে দিল

–আঠ আনা করকে এক রোপাইয়া।

–মোট তাহলে ন'টাকা হল। কিন্তু বিশ রূপিয়া পঁয়ষট্ পয়সাটা আসছে কোত্থেকে শুনি? মনে করেছো আমরা লেখাপড়া কিছু শিখিনি, না?

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বলল–আরে বাবা বকোয়াস মাৎ করো। দে দো ন'রূপাইয়া, আউর ভাগো হিঁয়াসে।

বাবলু বলল–ভাগব তো নিশ্চয়। আবার তোমার দোকানে ঢুকব!

–এ। মু সামালকে বাৎ বলো। নেহী তো মারকে মু তোড় দুংগা।

বিলু বলল–ব্যাটার আস্পর্ধা তো কম নয়। লোককে ঠকাতেও ঠকাবে আবার মারবে? বলেই রুখে দাঁড়াল, কই মার দেখি কেমন মারবি। আজ কে কাকে মারে তাই দেখ। তোর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে জেলে যাবো আজ। বলেই পাশের টেবিলে পড়ে থাকা সবজি কাটা ছুরিটা তুলে নিল বিলু।

লোকটি তখন পাঁঠার মতো লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে–বাঁচাও–বাঁচাও–মুঝে বাঁচাও। আরে ভাই, কই হ্যায়?

রাস্তার ধারে দোকান। তাই নিমেষের মধ্যে লোকজন জড় হয়ে গেল। দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরাও ছুটে এলো। অবশেষে বাবলুই সকলকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে মেটালো ব্যাপারটা। ভগবান রক্ষে যে স্থানীয় কিছু লোক বাবলুদের পক্ষ নিয়ে দোকানদারকেই দোষারোপ করল। সবাই বলল, এই লোকটার স্বভাবই হচ্ছে বেশি করে দাম বাড়িয়ে বলা এবং লোককে ঠকানো।

বাবলুরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। বাবলু বলল–তোর এই কাজটা ঠিক হয়নি বিলু। তুই তো কখনো এমন কাঁচা কাজ করিসনি। এবারে কেন এমন করলি? বিদেশে বিভূঁয়ে এসে এইভাবে কাউকে ছুরি দেখায়?

[চলবে]

ছবি : দিলীপ দাস

অঙ্ক জগতের জাদু

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

ভবিষ্যৎ-বাণী

জ্যোতিষীরা তো হাত দেখে গণনা করে কতো রকমের ভবিষ্যৎ-বাণী করে থাকেন। কিন্তু এখন আমি এমন একটা ম্যাজিকের কৌশল শেখাচ্ছি যা দেখলে জ্যোতিষীরাও বেশ ঘাবড়ে যাবেন। যাই হোক, খুলেই বলছি। জাদুকর তাঁর দর্শকদের একজনকে চার অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখতে বললেন। ধরা যাক তিনি লিখলেন 3574 – জাদুকর এবার সেই কাগজটাকে নিয়ে ওই সংখ্যাটার তলায় বেশ খানিকটা জায়গা রেখে একটা লাইন টেনে তার তলায় একটা সংখ্যা লিখলেন। ধরা যাক তিনি 13573 লিখেছেন আর তারপর বললেন, এটা হচ্ছে এই অঙ্কটার উত্তর। তারপর তিনি সেই কাগজটাকে আর একজন দর্শককে দিয়ে বললেন–প্রথম সংখ্যাটার তলায় চার অঙ্কের অন্য আর একটা সংখ্যা লিখে দিতে। ধরা যাক তিনি 7865 লিখলেন। তারপর তিনি তৃতীয় আর একজন দর্শককে বললেন তার তলায় চার অঙ্কের আরও একটা সংখ্যা লিখতে। ধরা যাক তিনি 2134 লিখলেন। এবার সংখ্যাগুলোকে যোগ করা হলো। অবাক ব্যাপার! সত্যি সত্যিই সেই যোগফলটা জাদুকরের সেই আগের থেকে লেখা উত্তরটার সঙ্গে মিলে গেল!

3574......প্রথম দর্শক লিখেছেন
7865......দ্বিতীয় দর্শক লিখেছেন
2134......তৃতীয় দর্শক লিখেছেন

———

13573.....জাদুকরের ভবিষ্যৎ বাণী

ম্যাজিক হিসেবে খুব চমকদার হলেও এর কৌশলটা কিন্তু খুব সহজ। প্রথম দর্শক চার অঙ্কের যে সংখ্যাই দিন না কেন, সেই সংখ্যাটা থেকে এক বাদ দিলে যা হয় সেটাকে লিখে পুরো সংখ্যাটার আগে একটা এক বসিয়ে দিলেই সেটা ওই অঙ্কটার উত্তর হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথম দর্শক দিয়েছিলেন 3574 এই সংখ্যাটা। সুতরাং উত্তর হিসেবে প্রথমে এক বাদ দিয়ে লিখতে হবে 3573 এবং তারপর তার আগে একটা '1' বসিয়ে দিতে হবে। এতেই পুরো যোগটার ভবিষ্যৎ বাণী হিসেবে উত্তরটা হলো 13573.

এরপর দ্বিতীয় দর্শক যে সংখ্যাটা লিখলেন সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা নেই। ওঁকে দিয়ে চার অঙ্কের যে কোনও একটা সংখ্যা লেখালেই চলবে। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী জিনিস হচ্ছে তৃতীয় দর্শকের লেখা সংখ্যাটা, কারণ তাঁর ওপরেই পুরো ম্যাজিকটার সাফল্য নির্ভর করছে। তিনি মোটেই 'সাধারণ দর্শক' ছিলেন না; তিনি ছিলেন জাদুকরের নিজের লোক এবং তাঁকে আগের থেকেই একটা হিসেব শেখানো ছিল। তাঁকে বলা ছিল দ্বিতীয় দর্শক যে সংখ্যাই লিখুন না কেন–তার প্রতিটি সংখ্যাকে 9 থেকে বাদ দিলে যা হয় সেই সংখ্যাগুলোকে পরের পর লিখতে। দ্বিতীয় ভদ্রলোক 7865 লিখেছিলেন। সুতরাং তৃতীয় দর্শক বা ওই সহকারী লিখবেন 5এর তলায় 4 (কারণ 9-5=4); 6এর তলায় 3 (কারণ 9-6=3), 8এর তলায় 1 (কারণ 9-8=1) এবং 7এর তলায় 2 (কারণ 9-7=2). এবারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 'দর্শক' এর দেওয়া সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে জাদুকরের দেওয়া 'ভবিষ্যৎ বাণী'র সঙ্গে মিলবেই মিলবে।

এবারে এটার গাণিতিক বিশ্লেষণ করা যাক। দেখা যাক কেন এটা হচ্ছে। প্রথম দর্শক যখন 3574 সংখ্যাটা লিখলেন তখন তার থেকে এক বাদ দিয়ে এবং সবার আগে 1 সংখ্যাটা বসিয়ে আমরা পেয়েছি 13573.

সমীকরণের ভাষায় লিখতে পারি:–

$$\begin{aligned}13573 &= 13574-1\\ &= 10000+3574-1\\ &= 3574+(10000-1)\\ &= 3574+9999 \quad\text{.........(i)}\end{aligned}$$

তৃতীয় দর্শক অর্থাৎ জাদুকরের সহকারীকে শেখানো ছিল দ্বিতীয় দর্শকের দেওয়া সংখ্যার প্রতিটি নম্বরকে 9 থেকে বাদ দিয়ে যা হয় সেই সংখ্যাগুলো লিখতে। সেজন্য তিনি দ্বিতীয় ভদ্রলোকের 7865 দেখে–প্রতিটি সংখ্যাকে 9 থেকে বাদ দিয়ে বা এক কথায় পুরো সংখ্যাটাকে 9999 থেকে বাদ দিয়ে লিখেছিলেন 2134; অর্থাৎ দ্বিতীয় দর্শকের সংখ্যার সঙ্গে তৃতীয় দর্শকের সংখ্যা যোগ করলে যোগফল 9999 হবে।

সমীকরণ (i) থেকে দেখতে পাচ্ছি জাদুকরের দেওয়া উত্তরটা হচ্ছে প্রথম দর্শকের দেওয়া সংখ্যা এবং 9999 এর যোগফল বা 13573=3574+9999.

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দর্শকের লেখা সংখ্যার যোগফল যেহেতু কায়দা করে 9999 করা হয়েছে সেই কারণে জাদুকরের ভবিষ্যৎ বাণীর উত্তরটা তো মিলবেই।

[চলবে]

মকরদ্বীপের রহস্য

রাধারমণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দাদু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন বোঝা গেল। আমি আর গণেশকাকু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি উত্তেজনা চেপে রেখে নিভে যাওয়া চুরোটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'মকরদ্বীপের নাম কোনো সরকারি নথিপত্তরে বা বইতে নেই জানি। তবে দ্বীপটা আছে। গ্রেট নিকোবরের মাইল আষ্টেক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছোট্ট এই দ্বীপটা। এর আয়তন মোটে ষোল বর্গ মাইল। এখানে জীব বলতে আছে কেবল বুনো ছাগল, শুয়োর আর হরিণ। আর আছে নানা জাতের পাখি, কাছিম আর কাঁকড়া। মানুষ এখানে থাকে না। নিকোবরীরা এই দ্বীপটাকেই বলে মকরদ্বীপ।'

আমি এ সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'আগে সেখানে কোনো দিন মানুষ থাকতো না?'

'ভাল মানুষ থাকতো কিনা জানি না, তবে খারাপ মানুষ যে থাকতো, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।' এই বলে দাদু চুরোটে একটা লম্বা টান দিলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'মকরদ্বীপের উত্তরে একেবারে সমুদ্দুরের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘুমন্ত আগ্নেয় পাহাড়। জিওলজিস্টদের মতে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে পাহাড়টা। তাঁরা বলেন, পাহাড়টা শেষ বার আগুন ছড়িয়েছিল আনুমানিক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে। তার আগে মকরদ্বীপে মানুষের বসতি ছিল কিনা জানা যায়নি। আর থাকলেও তার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে।'

সুভদ্র এ সময় ঘরে ঢুকে চায়ের কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে গেল। গণেশকাকু দু টিপ নস্যি টানলেন। নস্যির ঝাঁঝ আমার নাকে যাওয়াতে আমি কয়েকবার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁচো করলাম। দাদু অ্যাসট্রের ভেতর চুরোটের ছাই ঝেড়ে আবার আরম্ভ করলেন ওঁর গল্প। উনি বলতে লাগলেন, 'হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন হর্ষবর্ধনের আমলে। সেটা কোন সাল ছিল বলতে পার, দাদু-ভাই?'

ভারতবর্ষের ইতিহাস আমার পড়া। তবে সঠিকভাবে হিউয়েন সাঙের আগমনের সালটা আমার জানা নেই। বললাম, 'হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল হচ্ছে ছ-শ পাঁচ থেকে ছ-শ সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত। হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে।'

দাদু বললেন, 'তার মানে, হিউয়েন সাঙের ভারতে আসার সঠিক সালটা তোমার মনে নেই। শুনে রাখ, সেটা ছিল ছ-শ ত্রিশ খৃস্টাব্দ। তিনি ভারতে ছিলেন চোদ্দ বছর। ছ-শ চুয়াল্লিশ সালে তিনি এ-দেশ থেকে চলে যান। সে-সময় কালমকর নামে এক জলদস্যু মকরদ্বীপের অধীশ্বর হয়ে বসে। প্রাকৃতিক কারণেই মকরপাহাড়ের ভেতরটা ফাঁপা। সমুদ্রের দিকে, অনেক ওপরে পাহাড়ের দেয়ালে সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় এক-শ বর্গ মিটার পরিমাণের এক ফাটল। যেন সেটা একটা পাল্লাহীন প্রাকৃতিক জানালা। কালমকর আর তার

দলবল গোড়ার দিকে সেই জানালাটাকেই হয়তো ব্যবহার করতো দরোজা বা যাতায়াতের পথ হিসেবে।'

আমি গল্পটা শুনতে শুনতে বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। বললাম, 'তারপর ?'

'কিছুদিন বাদেই পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের গায়ে পাথর কেটে কালমকর একটা অদ্ভুত দরোজা তৈরি করে। অদ্ভুত এই কারণে যে, দরোজায় ছিল একটা মাত্র পাল্লা, আর সেটাও ছিল পাথরেরই তৈরি। তার ঠিক ওপরে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা ছিল এক ভয়-পাওয়ানো কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।' বলেই দাদু নিভে যাওয়া চুরোটে লাইটার জ্বেলে আর একবার আগুন ধরালেন।

গণেশকাকু বললেন, 'গল্পটা দেখছি সত্যিই ভয় পাওয়ানো। মকরদ্বীপ, মকরপাহাড়, কালমকর, এই নামগুলোও তো ভয় পাওয়ানো।'

দাদু বললেন, 'এই মাত্তর যে-মূর্তিটার কথা আমি বললাম, সেটাও ছিল কালমকরের। খৃস্টজন্মের কালে জাভায় বিস্তার লাভ করে হিন্দু-সভ্যতা। প্রায় পনেরোশ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতা তুঙ্গে ছিল সেখানে। সে-সময় সেখানে কালমকরের নক্শাটি ছিল বহুল প্রচলিত। "কালমকর" নামটা ওলন্দাজ পুরাতত্ত্ববিদদের দেওয়া। আসলে এটা কাল আর মকর, এই দুই ভিন্ন মূর্তি নিয়ে গড়া একটা নক্শা।'

আমি বললাম, 'কাল আর মকরের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কাল মানে হচ্ছে যম, আর মকর মানে গঙ্গার বাহন বা একজাতের কুমীর। ডিক্স্নারীতে এরকমই আছে। কিন্তু আমি কালমকর শব্দটা ডিক্স্নারী থেকে নিইনি। এটা নিয়েছি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা "সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ" নামে বইটা থেকে।' অ্যাসট্রেতে ছাই ঝেড়ে উনি আবার বলতে লাগলেন, 'ভীষণদর্শন কালের মুখটা রাক্ষসের মুখের আদর্শে রচিত, আর একে কালের প্রতিকৃতি বলে মনে করা হয়। কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে একটা ভারতীয় সিংহের মুখ। এর দুটো চোখই প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।

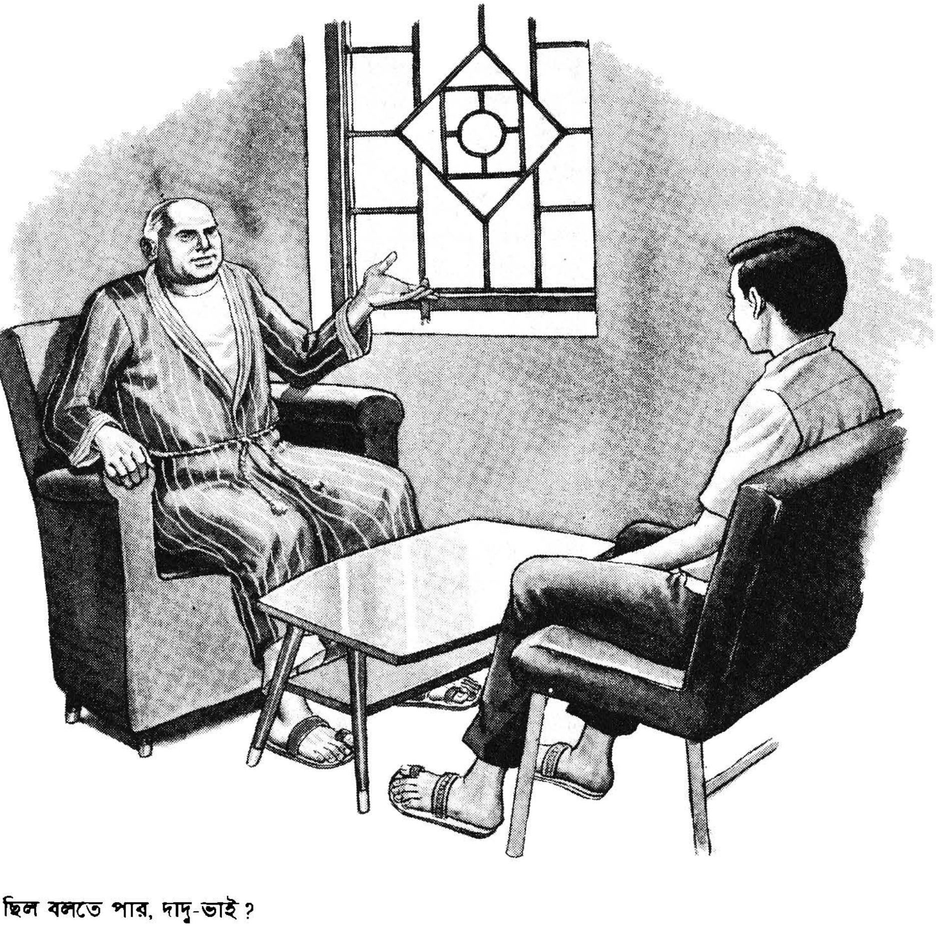

সেটা কোন সাল ছিল বলতে পার, দাদু-ভাই ?

এর নাকটা চওড়া। ওপরের ঠোঁটটা খুব পুরু। আর ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে দুটো দাঁত বেরিয়ে এসেছে।'

'সাংঘাতিক তো!' আমি উচ্চারণ করলাম।

দাদু আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'জাভায় কালমুখ সাধারণত দরোজার ঠিক ওপরে বা বাইরের কুলুঙ্গির ওপর খিলানের ঠিক মাঝখানে দেখা যেত। এর দু-দিকে থাকতো দুটো মকরমুখ। মকরমুখ দরোজার চৌকাঠের নিচের দু-পাশেও দেখা যেত। আবার কখনো কখনো সিঁড়ির ওপরে, দালানের অন্যান্য অংশেও দেখা যেত। মকরগুহার দরোজার ওপরেও খোদাই করা ছিল এই কালমকরের নক্‌শা।'

গণেশকাকু এ সময় শুধোলেন, 'আপনি নিজের চোখে নক্‌শাটা দেখে এসেছেন?'

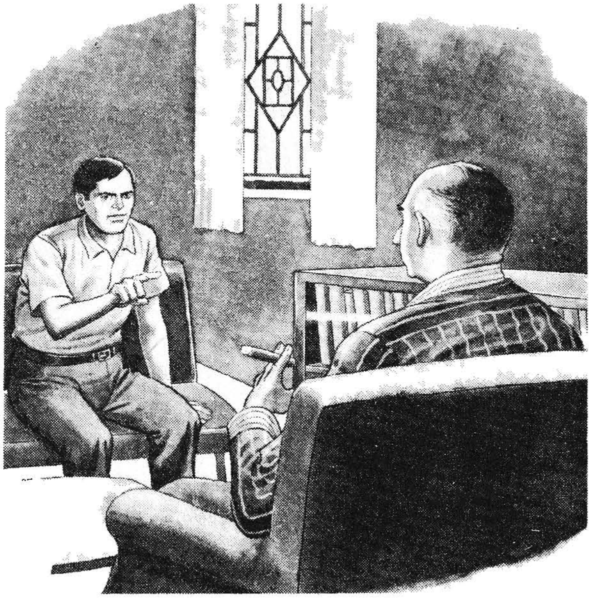

আপনি নিজের চোখে নক্‌শাটি দেখে এসেছেন?

দাদু বললেন, 'নিশ্চয়ই। তারপর শুনুন, দরোজাটা বন্ধ থাকলে তার অস্তিত্ব টের পাওয়ার জো নেই। নক্‌শাটা দেখেই তা বুঝে নিতে হয়। দরোজাটা খোলার জন্যে নিশ্চয়ই কোনো গোপন কৌশলের ব্যবস্থা আছে। অবিশ্যি আমরা অনেক চেষ্টা করেও কৌশলটা ধরতে পারিনি।'

গণেশকাকু এসময় মন্তব্য করলেন, 'এ যে দেখছি একেবারে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প!'

দাদু আবার বলতে লাগলেন, 'মকরদ্বীপে পানীয় জলের স্বাভাবিক উৎস ছিল না। আর থাকলেও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই জলদস্যু কালমকর দ্বীপের এক জায়গায় খনন করিয়েছিল একটা কূপ। সেই কূপটাই পরে পরিণত হয়েছে মিষ্টি জলের একটা ফোয়ারায়।

আমার মুখ দিয়ে এ সময় বেরিয়ে এলো, 'জলদস্যু কালমকর এখনো সেখানে আছে?'

'দূর বোকা! এ্যাদ্দিন কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!' বললেন দাদু।

'তাহলে তার কী হয়েছিল?' আমার প্রশ্ন।

'তার কী হয়েছিল, জানা যায়নি। হয়তো ঝড়ে জাহাজ-ডুবির ফলে সদলবলে সে তলিয়ে গিয়েছিল ভারত মহাসাগরের অতলে। অথবা মকরপাহাড়ে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দলবলসহ সে জ্যান্ত পুড়ে মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যু যেভাবেই ঘটে থাকুক, তা নিয়ে তখনকার বণিকদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বরং তার মৃত্যুর ফলে বণিকরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। সেই থেকে কালমকরের গল্প ভারতীয় বণিক আর প্রতিবেশী দ্বীপগুলোর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কিংবদন্তীর আকারে চলে আসছিল। ইদানীংকালে শুধু গ্রেট নিকোবরের নিকোবরীদের মধ্যেই জলদস্যু কালমকরের গল্পটা বেঁচে আছে।'

গণেশকাকু জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কোনো কালমকরের গল্প আপনার জানা নেই?'

'না। শুধু কালমকরের মুখোসধারী জলদস্যু কালমকরের কথাই আমার জানা আছে। সাত শতকের পাঁচের দশক পর্যন্ত বড়োজোর সে জীবিত ছিল।'

আমি বললাম, 'সে কালমকরের মুখোস পরতো?'

'নিকোবরীরা তাই বলে।' বললেন দাদু। এরপর গণেশকাকুর দিকে ঘুরে বললেন, 'আপনি আর কোনো কালমকরের কথা জানতে পেরেছেন নাকি?'

গণেশকাকু বললেন, 'আর কোনো কালমকরের কথা? না। তবে আশা করছি জানতে পারবো। যদি জানতে পারি, গ্রেট নিকোবর থেকে ঘুরে এসে সব আপনাকে বলবো। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আজ উঠছি।'

আমরা পুলিস-দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলাম, একটু দূরে রাস্তার ওপর ফুটপাতের ধার ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সির পেছনের সীটে বসা একটা লোক দরোজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে এদিকে। আমাদের দেখেই লোকটা মুখ সরিয়ে নিল, আর ট্যাক্সিটাও ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। পকেট থেকে নোটবুক বের করে ট্যাক্সির নম্বরটা আমি নোট করে নিলাম।

যে-লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়েছিল, তার মাথায় দেখলাম পাগড়ি বাঁধা। তার মুখটা যেন চেনা চেনা মনে হলো আমার। বিশেষ করে তার চোখ-দুটো। খুব বড়ো বড়ো চোখ। ঠিক কালকের দেখা সেই কাবুলিওয়ালাটার মতন, যে গতকাল বিকেলে কলিংবেল বাজিয়ে আমাকে বাড়ির ভেতর থেকে ডেকে এনে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল গণেশকাকুকে লেখা কালমকরের স্বাক্ষর করা চিঠিটা।

কে ওই লোকটা?

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

যে পাখিরা উড়তে পারে না

নারায়ণ চক্রবর্তী

ওপরের ঘরে ঢোকা মাত্র সন্তু কাকাকে ছেঁকে ধরল তাঁর ক্ষুদে ক্ষুদে ভাইপো ভাইঝিরা–কাকু, একটা গল্প বলো, কাকু, একটা গল্প বলো।

ওদের মা ঠাকুরপোর জন্য চা আর মটরশুঁটির কচুরি নিয়ে এসেছিলেন, বললেন–আগে খেতে তো দে ঠাকুরপোকে–

সন্তোষবাবু বললেন–ওদের খেতে দিলেন না বৌদি?

–ওরা খেয়েছে একটু আগে। তুমি খাও দিকি–

একটু হেসে নিচে চলে গেলেন শর্মিষ্ঠা।

ডক্টর সন্তোষ দত্ত মস্ত বড় প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। বিদেশের নামী-দামী পত্রিকায় তাঁর লেখা বার হয়। চা-জলখাবার খেয়ে মুখ মুছে বললেন–আমি তো শুধু বিজ্ঞানের গল্পই জানি–

মন্টু, ক্ষুদে, বাবাই, নীলা, ঝর্ণা সবাই সমস্বরে বলল–তাই বলো, তাই শুনবো।

ওরা কেউ পড়ে ক্লাস নাইনে, কেউ টেনে, কেউ সেভেনে, কেউ এইটে।

সন্তোষবাবু বললেন– তা হলে যে পাখিরা উড়তে পারে না তাদের গল্পই শোনো আজ–

–সে কি? অবাক হয়ে নীলা বলল–পাখা আছে বলেই না পাখি–উড়তে পারবে না কেন তারা?

বাবাই বলল–আঃ, থাম না দিদি, কাকুকেই বলতে দে।

এবারে বেশ গুছিয়ে বসে সন্তোষবাবু বলতে লাগলেন :

পাখিরা আজকের প্রাণী নয়, ওদের উদ্ভব হয়েছিল কোটি কোটি বছর আগে–সেই তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে ক্রেটাশাশ যুগে। ক্রেটাশাশ হচ্ছে মেসোজোইক মহাযুগের তিনটি যুগের শেষ যুগ। তারপর থেকে বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব অনুসারে এই কোটি কোটি বছরে পাখিদের আকার, আকৃতি ও আয়তনের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে হাজার হাজার প্রজাতির বহু বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের পাখির। পাখিদের ভেতরে যেমন ছোট্ট হামিংবার্ড কি চড়াই পাখি আছে, তেমনি আছে আফ্রিকার ঈগল কি আমেরিকার কন্ডরের মতো প্রকান্ড পাখি।

যদিও প্রায় সব পাখিই পাখা মেলে দিয়ে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়তে পারে, তবু পৃথিবীতে এমন কিছু পাখিও আছে যারা পাখা থাকলেও উড়তে পারে না।

ঝর্ণা বলল– কেন উড়তে পারে না কাকু?

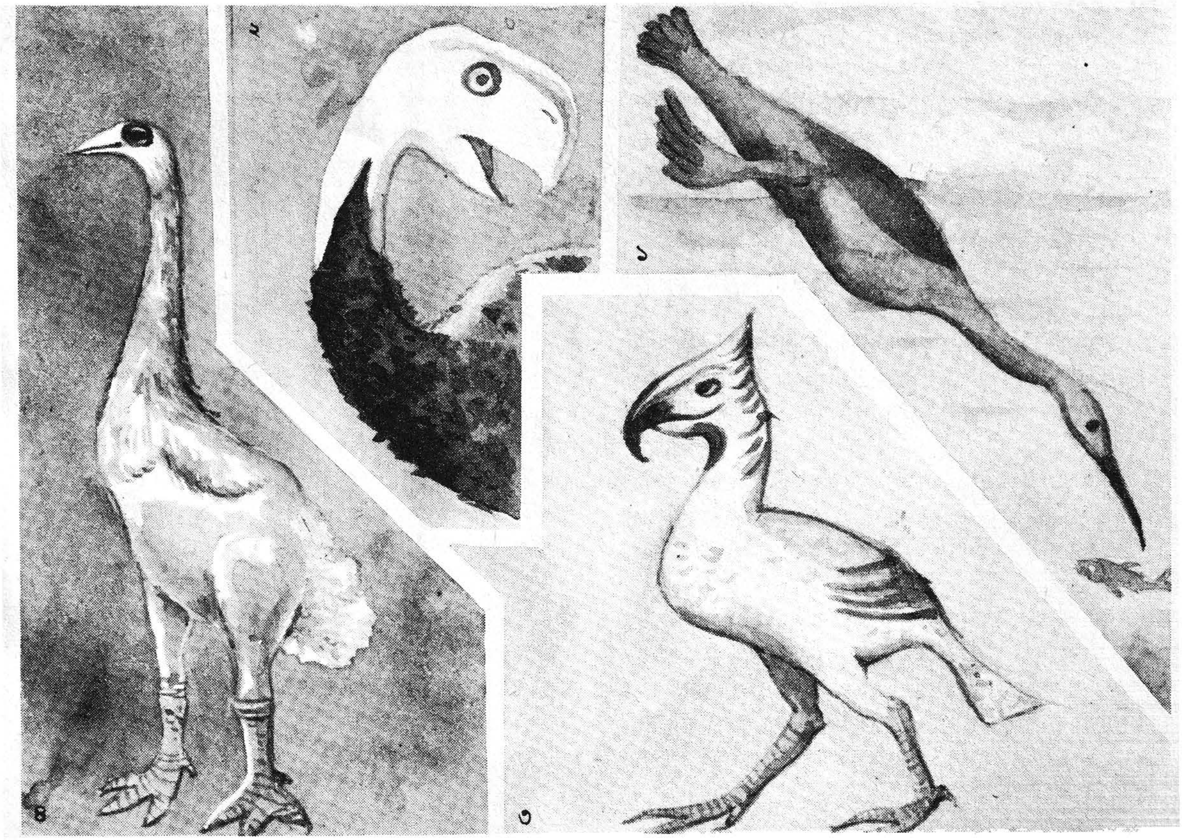

—না পারার কারণও আছে। এই সব না-উড়তে পারা পাখিদের পূর্বপুরুষরা লক্ষ কোটি বছর আগে নিশ্চয়ই উড়ন্ত জীবন অপেক্ষা না-ওড়া জীবনই বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল, তাই হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার না করার ফলে ওদের পাখা দুটি শক্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের পূর্ব-পুরুষরা তাই অন্য জীবনই বেছে নিয়েছিল। সেই জন্যই ওদের উত্তর-পুরুষরা আর উড়তেই পারে না। তবে তাদের পাখা দুটি—কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, লুপ্ত হয়ে যায়নি পাখিদের অন্য সব বৈশিষ্ট্যও। এখন তারা ঐ পাখা দুটিকে অন্য কাজে লাগায়।

ক্ষুদে হাততালি দিয়ে বলল—বাঃ ভারি মজা তো!

সন্তোষবাবু বলতে লাগলেন : আদিম উড়তে-না-পারা পাখিরা একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। আদিম উড়তে-না-পারা পাখির নাম হেস্‌পেরোর্‌নিস। অবশ্য আরও পাখি ছিল, হেস্‌পেরোর্‌নিস তাদেরই একটি। বলে হাতের বই খুলে হেস্‌পেরোর্‌নিসের ছবি দেখালেন সন্তোষবাবু। ভাইপো-ভাইঝিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল (চিত্র ১)

ছবি দেখা হয়ে গেলে বই বন্ধ করে সন্তোষবাবু বলতে লাগলেন : এখনও অনেক পাখি জলে ডুব দিয়ে মাছ ধরে বটে, কিন্তু ঐ আদিম পাখি হেস্‌পেরোর্‌নিসের কাছে এরা দাঁড়াতেই পারবে না গভীর জলে ডুব দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারে। এরা ছিল চার ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা, শরীরটি ছিল বেশ সরু ও ছিমছাম। ঠোঁট ছিল লম্বা, ধারালো এবং তীক্ষ্ণ। শক্তিশালী পা দুটি চমৎকারভাবে বৈঠার কাজ করত। পায়ের আঙুল হাঁসের পায়ের মতো মধ্যচ্ছদা দ্বারা যুক্ত ছিল। এদের মুখে ছিল অনেকগুলি সূচ্যগ্র, তীক্ষ্ণ ও খাঁজ-কাটা দাঁত। একবার ঐ লম্বা ঠোঁট ও দাঁত কোনো মাছের নাগাল পেলে আর তার রক্ষা থাকতো না।

হেস্‌পেরোর্‌নিস পাখিরা জলে ডুব দিতে পটু হলেও এরা আকাশে উড়তে পারতো না। কারণ এদের পাখা ছিল নামে মাত্র। এরা ডাঙাতেও ভালো করে হাঁটতে পারতো না ঐ প্রকান্ড শরীরটি নিয়ে। এদের পা দুটিও ছিল শরীরের একেবারে পিছন দিকে।

জল-পাখিদের ভেতরে হেস্‌পেরোর্‌নিসই আদিমতম পাখি।

এই পর্যন্ত বলে ভাইপো-ভাইঝিদের মুগ্ধ মুখে তাকালেন সন্তোষবাবু, একটু থেমে বললেন : কাগজ কলম নিয়ে হেস্‌পেরোর্‌নিসের বৈজ্ঞানিক পরিচয়টাও লিখে নাও তোমরা, পরে কাজে লাগবে।

সবাই খাতা-কলম নিয়ে এলে সন্তোষবাবু বললেন : হেস্‌পেরোর্‌নিস পাখিরা যে বর্গভুক্ত, সেই বর্গের নাম হচ্ছে হেস্‌পেরোর্‌নিথিফরমেস (Hesperornithiformes)। এই বর্গের কোনো পাখিই উড়তে পারতো না। এরা সবাই জলেই থাকতো। এই বর্গের আরও দুটি প্রজাতির পাখি আছে, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম ব্যাপটোরনিস ও নিওগাইওরনিস।

ওরা বর্তমান যুগে আর নেই বটে, কিন্তু নানা দেশে এদের জীবাশ্ম আছে। বিজ্ঞানীরা ঐ সব জীবাশ্ম পরীক্ষা করে, গবেষণা করে এদের শারীর সংস্থান, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। হেস্‌পেরোর্‌নিসের ছোট লেজটি অর্ধবৃত্তাকার পালক দিয়ে সাজানো থাকতো, বিজ্ঞানীরা এই সাজাবার পদ্ধতিকে বলেন পাইগোস্টাইল। ওদের পায়ের মাত্র দুটি আঙুলেই তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর থাকতো। এদের মস্তিষ্ক বৃহৎ সরীসৃপের মতো, মানে ডাইনোসরের মতো ছিল না, ছিল পাখির মস্তিষ্কের মতো। এদের গলায় থাকতো হেটারোকোয়েলাস নামে মেরুদণ্ডীয় হাড়। পা দুটি ছিল পাশের দিকে ঘোরানো। কোনো কোনো প্রজাতির হেস্‌পেরোর্‌নিসের আবার পাইগোস্টাইল থাকতো না।

চমৎকৃত হয়ে বলল বাবাই—শুধু জীবাশ্ম দেখে এত কথা জানা যায়?

মণ্টু ওকে দাবিয়ে দিয়ে বলল—নিশ্চয়ই যায়, নইলে কাকু জানলেন কি করে?

ক্ষুদে বলল—আর একটা উড়তে-না-পারা পাখির কথা বল কাকু—

সন্তোষবাবুর জন্য আর এক কাপ চা এসেছিল, তাই খেতে খেতে তিনি বললেন—বেশ শোনো তাহলে :

অতীতের উড়তে-না-পারা লুপ্ত পাখিদের মধ্যে আছে ডায়াট্রিমা। এদের উদ্ভব হয়েছিল প্রায় ছয় কোটি তিরিশ লক্ষ বছর আগে। ডায়াট্রিমা পাখিরা ছিল বিরাট, প্রায় সাত ফুট ছিল তাদের উচ্চতা। ওদের পা দুটি ছিল খুবই মজবুত আর শক্তিশালী। ওদের ঠোঁটও ছিল বিরাট। এই দেখ ডায়াট্রিমা পাখির ছবি— বলে বই খুলে ডায়াট্রিমা পাখির ছবি ওদের দেখালেন সন্তোষবাবু। ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল সব্বাই। (চিত্র ২)

সন্তোষবাবু বলতে লাগলেন—ডায়াট্রিমা পাখিদের পা দুটি ছিল খুবই মজবুত আর শক্তিশালী। ওদের ঠোঁটের রঙ ছিল টকটকে লাল আর বিরাট বড়। ওদের সারা গায়ে লালচে রঙের পালক থাকতো। আকারে প্রকান্ড হওয়ায় আর পাখা দুটি ছোট হওয়ায় উড়তে পারতো না ডায়াট্রিমারা। এদের লেজ ছিল ছোটখাটো।

ঝর্ণা গ্লাস টেনে পড়ে, সে-ই বলল—ডায়াট্রিমার বৈজ্ঞানিক নাম কি কাকু?

—লেখ, ওদের বৈজ্ঞানিক নাম ডায়াট্রিমা স্টেইনি (Diatryma Steini)। ডায়াট্রিমা হচ্ছে গণের নাম আর স্টেইনি হচ্ছে প্রজাতির নাম। সেই অতীত যুগে ডায়াট্রিমার মতো আরও অনেক পাখি ছিল, ধরতে গেলে পাখিতে পাখিতে পৃথিবী একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল, এবং সেই লক্ষ লক্ষ পাখিদের ভেতরে অনেক পাখিই উড়তে পারতো না।

ফোরোরহাকোস পাখিরাও লুপ্ত পাখি। এরা অনেকটা ডায়াট্রিমার মতোই ছিল। ওরা থাকতো দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিকে–প্যাটাগোনিয়াতে। ওদের উদ্ভব হয়েছিল দুই কোটি বছর আগে। উড়তে পারতো না ফোরোরহাকোসরাও। এদের মাথা ছিল প্রকান্ড, অনেকটা বর্তমান ঘোড়ার মাথার মতো। এই পাখিরা উচ্চতায় ছিল সাত ফুট, তাই ওদের অত বড় মাথাটা মনে হত বেঢপ, বেমানান। চঞ্চুর শেষ প্রান্ত হুকের মতো বাঁকানো ছিল, ঐ হুক আবার ছিল দারুণ তীক্ষ্ণ। সেই সূচ্যগ্র বক্র চঞ্চুর সাহায্যে ফোরোরহাকোসরা শিকার করা প্রাণীর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। এই দেখ ফোরোরহাকোসের ছবি–বলে বই খুলে ছবি দেখালেন সন্তোষবাবু (চিত্র ৩)।

ক্ষুদে বলল–অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো ঠোঁট, তাই না দিদি?

সন্তোষবাবু বললেন – দেখছ, এদের পাখা কত ছোট আর দুর্বল, তাই তো ওরা উড়তে পারতো না।

এবার শোনো মোয়া পাখির কথা। খাবার মোয়া নয়, পাখির নামই মোয়া। এরাও আজ লুপ্ত বটে, কিন্তু কিছুদিন আগেও বিচরণ করত পৃথিবীতে। মোয়ারাও উড়তে-না-পারা পাখি। এরা থাকতো নিউজিল্যান্ডে, সেখানে এদের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। দুটি গোত্রে কুড়িটি প্রজাতিতে বিভক্ত ছিল মোয়া পাখি। নানান আকারের মোয়া দেখা যেতো নিউজিল্যান্ডে। কোনো পাখির উচ্চতা হত তিন শ সেন্টিমিটার। সম্ভবতঃ মোয়ারা ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি উদ্ভিদ খেতো। ওদের ঠোঁট ছিল খাটো। উড়তে না পারলেও দ্রুত ছুটতে পারতো মোয়ারা। ঠিক কি কারণে তারা লুপ্ত হয়ে গেল তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। এদের একটা বৈজ্ঞানিক পরিচয়ও আছে।

–কী কাকু, কী কাকু–কলকলিয়ে উঠলো ক্লাস টেনের আর ক্লাস নাইনের ঝর্ণা আর নীলা। খাতা খুলে, কলম নিয়ে তৈরি হয়ে বসল ওরা।

সন্তোষবাবু বললেন – মোয়ার পরিচয় এই রকম : বর্গ : ডাইনরনিথিফরমেস (Dinornithiformes) । বলে বই খুলে সন্তোষবাবু বললেন, এই দেখ নিউজিল্যান্ডের লুপ্ত, উড়তে-না-পারা মোয়ার ছবি। এদের পালকে বার্বিকল নামে ছোট ছোট আঁকশির মতো জিনিসটি থাকতো না (চিত্র ৪)।

তোমরা মাদাগাস্কার দ্বীপের নাম শুনেছ তো? ঐ দ্বীপে অনেক দিন আগে থাকতো এলিফ্যান্ট-বার্ড বা হাতি-পাখি। এরাও আজ লুপ্ত। এলিফ্যান্ট বার্ডরা উড়তে পারতো না। ঐ দ্বীপের বালি খুঁড়লে এখনও এই লুপ্ত পাখিদের প্রকান্ড প্রকান্ড ডিম পাওয়া যায়। এই সব ডিম লম্বায় ৩০.৫ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ২৪.৫ সেন্টিমিটার হয়। বিরাট আকারের পাখি বলে স্থানীয় লোকেরা এদের বলত এলিফ্যান্ট-বার্ড। কোনো কোনো পাখি তো উচ্চতায় হত ৩০০ সেন্টিমিটার। এদের পাখা ছিল ছোট ছোট, পেছনের পায়ে ছিল চারটি করে তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত আঙুল। পা দুটি ছিল খুবই মজবুত আর শক্তিশালী, তাই তারা খুব জোরে ছুটতে পারতো। এলিফ্যান্ট-বার্ডরা বালিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তেই বর্তমান অস্ট্রিচ্ পাখির মতো ডিম পাড়তো। ইঞ্চির মাপে এক একটা ডিম ১২ ইঞ্চি লম্বা আর ৯ ইঞ্চি চওড়া। ঐ ডিমের ভাঙা খোলায় দুই গ্যালন তরল পদার্থ রাখা যায়। ঐ একটি ডিমই প্রায় ১৫০টি মুরগীর ডিমের সমান।

শুনে সন্তোষবাবুর ভাইপো-ভাইঝিরা তো হাঁ।

সন্তোষবাবু বললেন–এর ছবি আমার কাছে নেই, তবে বৈজ্ঞানিক পরিচয়টা লিখে নাও। বর্গ : এইপিওরনিথিফরমেস (Aepyornithiformes); গণ : এইপিওরনিস (Aepyornis)।

ক্ষুদে আবদার করল–এবার এখনো বেঁচে আছে অথচ উড়তে পারে না সেই সব পাখিদের কথা বলো কাকু–

অন্য সবাই সমস্বরে বলল–হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো।

সন্তোষবাবু বললেন – কিন্তু সে যে অনেক পাখি, একদিনে কি সবটা বলা যাবে?

আবার সমস্বর, একদিনে না হয় তো দুদিনে বলবে কাকু।

হার মেনে হাসি মুখে সন্তোষবাবু বললেন : বেশ, শোনো তাহলে। টিনামন নামে যে পাখিদের দক্ষিণ মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায় তারাও উড়তে পারে না, কেউ কেউ যদিও বা ওড়ে, তা হলেও খুব সামান্য দূরেই উড়ে যেতে পারে। টিনামন পাখিরা তিতিরের চেয়ে সামান্য বড় আর পিরট্রিজ নামে পাখির চেয়ে সামান্য ছোট হয়। এদের লেজ নেই, তাই পুচ্ছটি উচে তুলে নাচাতে পারে না। তাড়া করলে টিনামন পাখিরা দ্রুত পালায়। আবার দ্রুত দৌড়াবার সময়ে সামান্য দূরত্বের জন্য ওড়েও। এই পাখিরা উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পদার্থ খায়। ওদের পালকে বিভিন্ন রঙের ছোপ ছোপ থাকে। ঐ রঙই তাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিশে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। শত্রুর চোখে ধুলো দেবার এটা একটা প্রকৃতি-দত্ত কৌশল। টিনামন পাখিদের ডিমগুলো সাদা ও চকচকে। ঐ ডিমে পুরুষ টিনামন তা দেয়। এবার ওদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় লেখো তোমরা, বর্গ– টিনামিফরমেস (Tinamiformes)। গোত্র একটি মাত্র, তার নাম : টিনামাইডি (Tinamidae)। এই গোত্রে ৫০টি প্রজাতির টিনামন পাখি আছে। দুটি প্রজাতির পুরো বৈজ্ঞানিক নামও লিখে নাও : ইউড্রোমিয়া এলিগান্‌স্ আর ক্রিপট্যুরেল্লাস ভেরিগাটাস–

লিখতে না লিখতেই লোড-শেডিং হয়ে গেল। বাচ্চারা হৈ হৈ করে উঠলো চারদিকে গভীর কালো অন্ধকার দেখে। ওরই মধ্যে সন্তোষবাবু বললেন – বাকিটা আর একদিন বলব, কেমন? কেমন লাগলো তোমাদের, অ্যাঁ?

ভাইপো-ভাইঝিরা সমস্বরে বলে উঠলো : দারুণ! দারুণ–

ছবি : রাহুল মজুমদার

পোলাম্যানের স্বপ্ন

অজিতকুমার দাস

ইন্দোনেশিয়ার এক শহরে পোলাম্যান বাস করত। সে বড়ই গরীব। ভিক্ষা করেই তার দিন চলতো। একদিন সে এক আজব স্বপ্ন দেখল, দেবতা ব্রহ্মা তার কাছে এসে বললেন, পোলাম্যান, তুই না একটা এমন কাজ করবি যার জন্য সবাই তোর নাম চিরকাল করবে।

পোলাম্যান তো এ স্বপ্নের কোনো মানেই খুঁজে পেল না। ভিক্ষে করে যার দিন চলে সে আবার কি আশ্চর্য কাজ করবে। স্বপ্ন, নিছকই স্বপ্ন।

একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ও একটা মন্দিরের ছায়ায় গিয়ে বসল। গুনে দেখতে লাগল, সারাদিনে ওর কত রোজগার হয়েছে। মাত্র নটা তামার পয়সা পেয়েছে ও! তা দিয়ে কিছু তো কেনা যাবেই না। এক বেলার খোরাকও হবে না। খুব দুঃখ হলো ওর। এমন চললে স্বপ্নটা ওর সফল হবে কি করে?

নটা তামার পয়সা নিয়েই ও বাজারে গেল। এক খাবারের দোকানদারকে পয়সা কটা দেখিয়ে কিছু খাবার চাইল। দোকানদার তো রাগে তাকে ধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিল।

ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল ওর। আরও কিছু পয়সা চাইবে বলে ও আবার পথের দিকে এগোল। চলতে চলতে ও পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ল এক গভীর জঙ্গলে। সেখানে একটা গাছের তলায় বসে ছিল এক বুড়ি। তার পাশে ছিল একটা ঝুড়ি।

পোলাম্যান কাছে গিয়ে বলল, তোমার ঝুড়িতে কি খাবার আছে কিছু? আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

বুড়ি ঝুড়ির ঢাকনা খুলল। ভিতরে অমনি কটা মাছ খলবল করে উঠল। কটা তো ঝুড়ির বাইরেই লাফিয়ে পড়ল। বুড়ি বলল, তুমি মাছগুলো সব কিনে নাও। কিনে নাও জলদি।

পোলাম্যান বলল, কিনব যে, মাত্র তো নটা তামার পয়সা আছে সঙ্গে।

বুড়ি হাত বাড়িয়ে বলল, ওতেই হবে দাম।

মাছ বেচে বুড়ি কোথায় চলে গেল। পোলাম্যান ভাবল, এ মাছ ও রান্না করে খাবে। বন থেকে শাক পাতা যোগাড় করে ভাল করে রান্না করবে মাছ।

আগুন জ্বালতে যাবে যেই, অমনি পোলাম্যান শুনতে পেল কোথায় কে যেন ফিসফিস করে বলছে, এ মাছ তেমন উপাদেয় হবে না হে, মিছে রান্না করা।

কে কথা বলছে! একবার এদিক একবার ওদিক তাকিয়ে দেখল পোলাম্যান। কেউ কোথাও নেই! তবে? তবে কি ও আকাশে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দকেই কথা বলে ভেবেছে! তাই হবে। ও আবার আগুন জ্বালাবার তোড়জোড় শুরু করল। শাকসব্জী দিয়ে এমন একখানা ঝোল বানাবে ও যার কথা ভাবতেই ওর জিভে জল এসে গেল।

কিন্তু কি সর্বনাশ! বনজঙ্গল ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে একটা বুনো পাগলা ষাঁড়। সেটা তো ওর দিকেই তেড়ে আসছে! ভীষণ ভয় পেল পোলাম্যান। এখন ও করবে কি? মরবে নাকি ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে। তখনি শুনতে পেল ফের সেই ফিসফিসে কথা, ওটার দিকে দুটো মাছ ছুঁড়ে দাও। ছুঁড়ে দাও শীগ্গির।

তাড়াতাড়ি তাই করল পোলাম্যান। থমকে দাঁড়াল ষাঁড়টা,

দুবার মাথা নাড়ল। তারপর মাছ দুটো মুখে নিয়ে যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকেই চলে গেল।

আর রান্না। পোলাম্যান জায়গাটা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। ও আবার হাঁটা দিল। যেতে যেতে, গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়ল। হঠাৎ শুনতে পেল কোথায় যেন কে একজন মেয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে। কে কাঁদে? এদিক খুঁজল, সেদিক খুঁজল পোলাম্যান, শেষে দেখল, একটা গাছের তলায় এক পরমাসুন্দরী কন্যা বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কন্যা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাবার জন্যই ব্রহ্মা ভগবান তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। ওকে ডাইনি বলে গাঁয়ের লোকেরা পুড়িয়ে মারতে গেছিল। ও ডাইনি নয়।

পোলাম্যান কিছু বলার আগেই জঙ্গলের মধ্যে হাঁকডাক শোনা গেল। দল বেঁধে গাঁয়ের লোকরা আসছে মেয়েটিকে ধরতে। সে ভীষণ ভয়ে পোলাম্যানের পিছনে লুকাল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমি মরতে চাই না, মরতে চাই না, আমাকে বাঁচাও।

দেখল পোলাম্যান, মানুষগুলো প্রায় কাছেই এসে পড়েছে। এই বুঝি ওদের ধরল। কি করবে ও এখন? ঠিক তখনি আবার পোলাম্যান সেই ফিসফিসানি শুনতে পেল, ঝুড়ি থেকে দুটো মাছ ওদের দিকে ছুঁড়ে দাও। দাও ছুঁড়ে, তাড়াতাড়ি।

পোলাম্যান একটুও দেরি না করে তাই করল। অবাক কান্ড, বন থেকে দুটো ইয়া কেঁদো বাঘ হালুম করে বেরিয়ে এসে মাছ দুটো গিলে খেল। খেয়েই এমন গর্জন ছাড়ল যে লোকগুলো পড়িমরি দৌড় লাগাল গ্রামের দিকে। বাঘ দুটোও আবার কোথায় চলে গেল।

পোলাম্যান তখন মেয়েটিকে বলল, যাও, এবারে তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও। আমিও যাই আমার পথে।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, সেখান থেকেও ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

কি আর করবে পোলাম্যান। তাকে সঙ্গে নিয়েই ও চলতে থাকল। চলতে চলতে খিদেতে ও আর পারে না। মেয়েটিকে বলল, ঝুড়ির মাছ কেটেকুটে রান্না করে খাই এসো। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

তখনি পোলাম্যান শুনতে পেল, ঝুড়ির ভিতর থেকে মাছগুলোই ফিসফিস করে বলছে, আমাদের খেও না, খেও না, তোমাদের তা হলে আর কোনো বিপদ হবে না।

কাছেই একটা নারকেল গাছ ছিল। আর গাছের কাছে ছিল একদল বাঁদর। বাঁদরগুলো ওদের দেখেই ঝুনো নারকেল পেড়ে দিল। দুজনে পেট ভরে নারকেল খেয়ে বাঁদরদের ধন্যবাদ দিয়ে আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে অনেক দূর এসে পোলাম্যান মেয়েটাকে বলল, এখন তুমি না হয় তোমার মার কাছে ফিরে যাও।

মেয়েটি আবার কান্না জুড়ল। সেখান থেকেও ওকে ধরে-ধরে নিয়ে যাবে গাঁয়ের বদ লোকগুলো। কান্না দেখে পোলাম্যান বলল, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মতো একজন ভবঘুরের সঙ্গে কি করে তুমি থাকবে? তাছাড়া এই বনের কোথাও কোনো ঘর নেই। এক্ষুণি অন্ধকার নামবে। জন্তুজানোয়ার বেরুবে।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। আর কোথাও যাব না।

কি আর করে পোলাম্যান, ওকে সঙ্গে নিয়েই চলল এগিয়ে। খুঁজতে লাগল বনের বাইরে যাবার পথ। কিছুদূর যাওয়ার পরেই কানে এল ওদের বাঘের গর্জন! সে গর্জন যেন ওদের দিকেই আসছে।

ভীষণ ভয়ে পোলাম্যান বলল, চল, চল, আমরা একটা বড় গাছের ওপরে উঠে বসি। কিন্তু কি সর্বনাশ। আশেপাশে কোথাও কোনো বড় গাছ নেই। কি করবে ওরা। ঠিক তখনি আবার মাছেরা ফিসফিস করে বলল, চারটে মাছ ওদের দিকে ছুঁড়ে দাও। দাও তাড়াতাড়ি। পোলাম্যান তাই করল তাড়াতাড়ি। মাছ খেয়েই বাঘের দল জঙ্গলের গভীরে চলে গেল।

অবাক হয়ে মেয়েটি বলল, পোলাম্যান, তুমি তো মস্তবড়

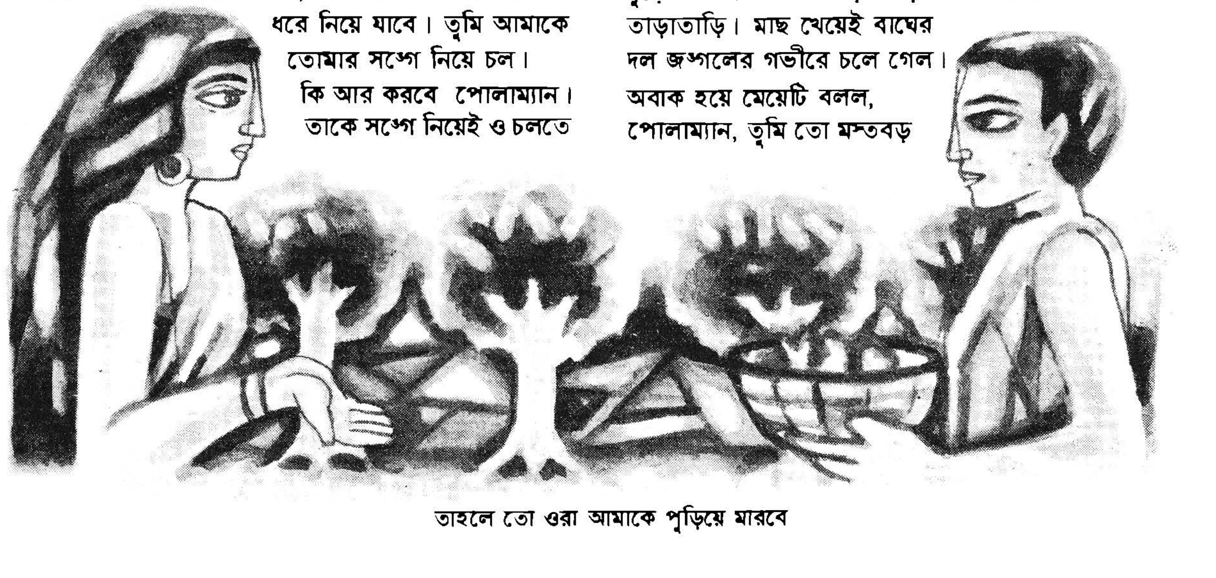

তাহলে তো ওরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে

যাদুকর। আর তাহলে তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

কিন্তু পোলাম্যান দেখল ঝুড়িতে আর মাত্র দুটো মাছ আছে। এদিকে জঙ্গলের যে কোথায় শেষ তা কে জানে! দুটো মাছ দিয়ে আর ও কত কি করতে পারবে। ভীষণ ভয় আর চিন্তা হলো পোলাম্যানের । বলল, এখানে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চল, চল, আমরা এগিয়ে যাই। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। তার আগেই কোথাও আশ্রয় চাই।

ওরা জোর কদমে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে পথে পড়ল একটা বাঁশঝাড়। তা ওরা পার হয়ে গেল। তারপর কাঁটাবন। সেখানে ওরা বারবার হোঁচট খেতে লাগল। পথ আর ওরা খুঁজে পায় না। কোথায় যাবে, কোন দিকে যাবে।

হঠাৎ দূরে ঝোপের আড়ালে কেমন যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেল ওরা। পোলাম্যান বলল, তাহলে কি সকাল হয়ে গেল?

না, ওটা আলো নয়। ওটা একটা হ্রদ। হ্রদের জল চকচক করছে, দূর থেকে তাই আলো বলে মনে হচ্ছিল। ওরা দুজনে সেদিকেই এগিয়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ বাদেই ওরা তীরের কাছে পৌঁছে গেল। অমনি কোথা থেকে দুটো বাদুড় উড়ে এসে ওদের দুজনের মাথায় বসল । ওরা হুস করল, হাস করল, কিছুতেই উড়ে যায় না বাদুড় দুটো! তখনি মাছ দুটো বলল, আমাদের এক একটা এক একজন মাথায় রাখ। রাখ এখুনি।

ওরা দুজনে তাই করল। যেই করা, বাদুড় দুটো মাছ দুটোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মাঝ হ্রদের জলে ছেড়ে দিল। মাছের ঝুড়ি খালি, তাই পোলাম্যান ওটাও তুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলল হ্রদের মাঝে। তখনি সেখানে হ্রদের বুকে জাগল একটা ফোয়ারা।

মাছ দুটো জলের বুকে ভেসে উঠে বলল, পোলাম্যান, পোলাম্যান, তুমি আর সুন্দরী কন্যা এই হ্রদের ধারেই বাসা বেঁধে বাস কর। তার জন্যই তো ভগবান ব্রহ্মা তোমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। এই হ্রদের নাম আজ থেকে হলো পোলাম্যান হ্রদ। আর আজ থেকে এই জায়গাকে সবাই বলবে পোলাম্যানের দেশ। এ-কথা বলে মাছ দুটো গভীর জলে ডুব দিল।

পোলাম্যান আর সুন্দরী কন্যা তারপর থেকে ওই হ্রদের তীরেই মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

নতুন কিছু করার আনন্দ যাতে নষ্ট না হয় তাই এমন কিছু মডেল তৈরির কায়দা লিখলাম যেগুলো আজও কোথাও দেখতে পাবে না।
গঙ্গেশ ঘোষ মদন মুখোপাধ্যায়।
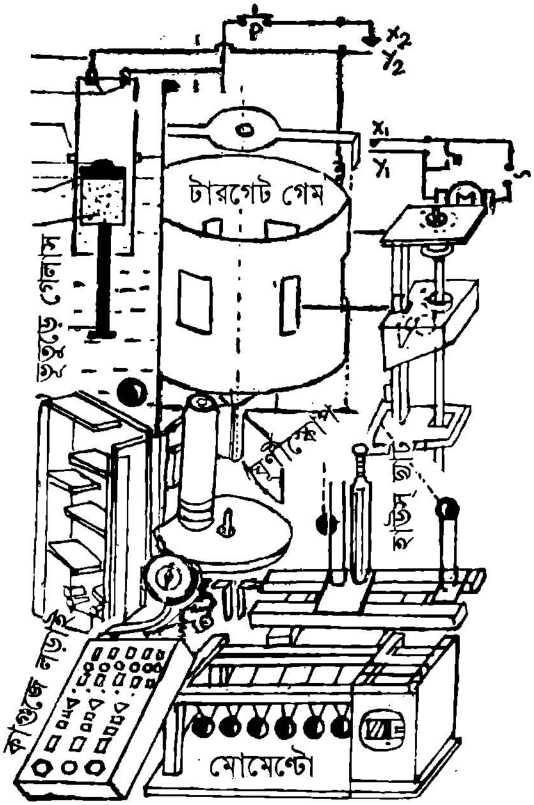

হাতে কলমে
গঙ্গেশ ঘোষ মদন মুখোপাধ্যায়
দাম—নয় টাকা
শচীন দাসের
আবিষ্কারের গল্প ৯·০০
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

হাতে কলমে

চুপ! সার্কাস চলছে–২

এখন দশ মিনিটের বিরতি। আমরা বিরতির পর দেখাবো ট্রাপিজের খেলা। দেখবেন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা শূন্যে কিভাবে শরীরের কসরৎ দেখাচ্ছে। এই বলে, ক্যাপ্টেন টুপি খুলে হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রীনরুমে ঢুকলো।

দিদা বাঁ হাতে গরম দুধ নিয়ে ডান হাতে স্যালুট করে বললেন–সাব, আপনার কোল্ড ড্রিংকস্।

–হ্যাঁ, দাও। আচ্ছা, আজকাল কি জন্তু-জানোয়ার ভাল করে দেখাশোনা হয় না! তোমরা কি জানো না–ওরা আমাদের সার্কাসের সব কিছু। সার্কাসকে ভালবাসতে হলে ওদের ওপর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে।

বুঝলাম পুঁচকে ক্যাপ্টেন সেদিন সেজমামার সাথে 'Great Indian Circus'-এর তাঁবুতে গিয়ে এই কথাগুলো শিখেছে।

আবার সার্কাস শুরু হলো।

ক্যাপ্টেন শুরু করলেন–ট্রাপিজের খেলার শুরুতে প্রথম যেটা দেখাবো সেটা হলো– "মিস্টার নটবরলাল কা সার্কাস কা সাবাসী খেল"।

ব্যস্, নাম শুনেই বাচ্চারা একবার হাত তালি দিয়ে উঠলো। বুঝলাম, খেলটা বাচ্চাদের মনপসন্দ আর দেখলাম, মিস্টার নটবরলাল (মানে একটা পুতুল) একটা পিচবোর্ডের বাক্সের সামনে হাত পা ছুঁড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে (প্রথম ছবিতে দ্রষ্টব্য)। জিনিসটা তৈরি হয়েছে দিয়ার ছোটমামার হাতে, তাই বাকিটা ছোটমামার কাছ থেকে শুনেই তোমাদের জানাচ্ছি।

১। ৮x"৬x"৩" পিচবোর্ডের বাক্স্, ২। ১-এর ভেতরে ঠিক ঢুকে যায় এমন একটা বাক্স ১১/২" বেধের। ৩। ১১/২" চওড়া, বেশ কিছুটা লম্বা (৭") পিচবোর্ডের টুকরো। ৪। ৩-এর তিন ভাগের দুভাগেএকটা ছোট্ট গর্ত ★

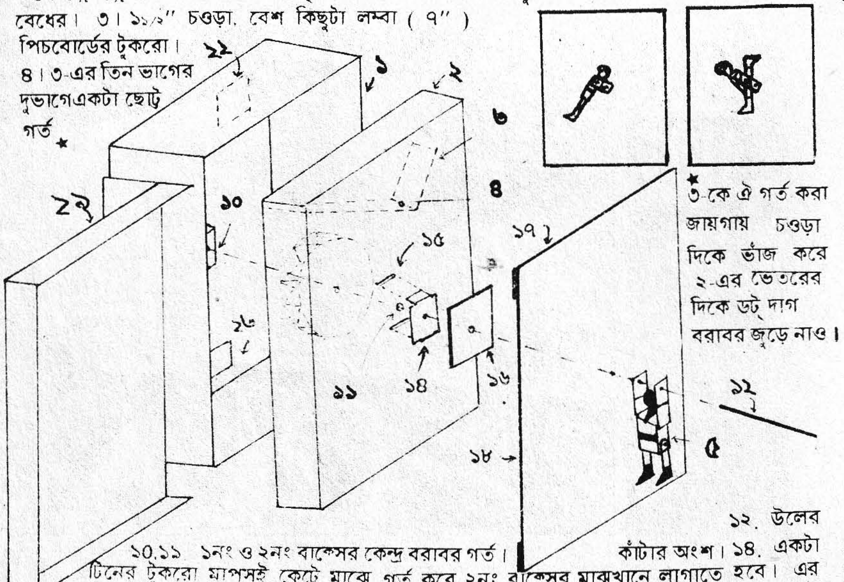

★ ৩-কে ঐ গর্ত করা জায়গায় চওড়া দিকে ভাঁজ করে ২-এর ভেতরের দিকে ডট্ দাগ বরাবর জুড়ে নাও।

১০,১১ ১নং ও ২নং বাক্সের কেন্দ্র বরাবর গর্ত। ১২. উলের কাঁটার অংশ। ১৪. একটা টিনের টুকরো মাপসই কেটে মাঝে গর্ত করে ২নং বাক্সের মাঝখানে লাগাতে হবে। এর ফলে খাঁজকাটা চাকা (৮) মসৃণভাবে ঘুরতে পারবে। এর জন্যে ২নং বাক্সের গায়ে দুটো খাঁজ (১৫) কেটে নাও। ১৬. টিনের পাতের (১৪) ওপর একটা কার্ডবোর্ডের টুকরো আঠা দিয়ে জোড়। ১৭. দুটো ২/২" লম্বা কার্ডবোর্ডের স্ট্রিপ কাটো। ১৮. একটা ৮"x ৬" কার্ডবোর্ডের টুকরোর ওপরে ও নিচে চওড়া দিকে ১৭ নং স্ট্রিপ দুটো আঠা দিয়ে জুড়বে। তারপর এই পিচবোর্ডটা ২নং বাক্সের সামনের দিকে জুড়ে নাও। ১৯,২০. পুতুলের হাতের ওপরের দিকে দুটো গর্ত। উলের কাঁটা (১২) প্রথমে কেন্দ্রের গর্ত বরাবর ছবির মতো পরপর ঢুকিয়ে যাও। তারপর পুতুলের হাতের গর্ত (১৯ ও ২০) দিয়ে ঢুকিয়ে গালা বা কেমিক্যাল আঠা দিয়ে জুড়ে নাও। এছাড়া চাকার (৮) সাথেও উলের কাঁটা (১২) শক্তভাবে জুড়বে। ২১. বাক্সের ঢাকনা। এটা ইচ্ছে করলে পিচবোর্ড কেটে তৈরি করে বাইরের বাক্সের (১) গায়ে আঠা দিয়ে জুড়ে নিও। ২২. পেছনের বাক্সের (১) দেওয়ালের ওপরের দিকে গর্ত করে (৩নং) বাঁকানো তাকে মিহি বালি ভরে নাও। ২৩. ১নং বাক্সের নীচের দিকে গর্ত করে রাখো বালি বার করবার জন্যে।

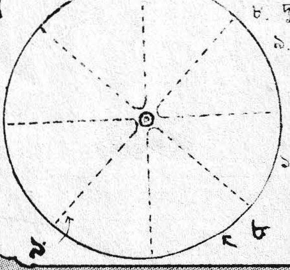

৮. দুটো কার্ডবোর্ডের চাক্তি (২৯/২" ব্যাসের) কাটো।

৯. ২১/৪" চওড়া চারটে ৫" লম্বা কার্ডবোর্ডের টুকরো কেটে মাঝখান বরাবর ভাঁজ কর। এই ভাঁজকরা টুকরোগুলো চাক্তি দুটোর (৮) মাঝখানে ছবির মতো আঠা দিয়ে জোড়।

১৩. চাকা দুটোর (৮) যে কোনো একটার অর্ধগোলাকৃতি চাক্তি জুড়ে নাও একদিক ভারী করার জন্য।

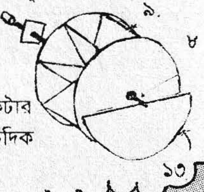

পুতুলের মাথাটা একটা পিচবোর্ডে এঁকে কেটে নাও। তারপর রঙ দিয়ে চোখ মুখ এঁকে নেবে। বাটামের মাঝে খাঁজ কেটে মাথাটা ঢুকিয়ে দেবে।

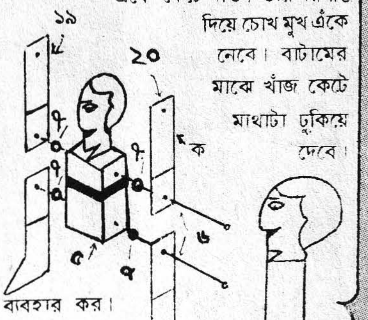

৫. হাল্কা কাঠের বাটামের টুকরো কেটে তৈরি পুতুলের দেহ। ক, খ। হাত পা দুটো করে কার্ডবোর্ড কেটে তৈরি হবে।

৬. হাত-পা দুটোর অক্ষ হিসেবে আলপিন ব্যবহার কর।

৭. হাত-পা-এর গতি সচ্ছল করতে পুঁতি ব্যবহার কর। রঙীন কাগজ জুড়ে পুতুল তৈরি হবে।

বাক্সটা সুন্দরভাবে রঙ করে নাও। বাক্সের সব কাজ শেষ হয়ে গেলে, বাক্সের মাথায় টোকা মারলে ৮নং চাকার খাঁজগুলোতে (৯) বালি পড়ে ভারী হয়ে গেলে চাকাটা ঘুরে যাবে। ফলে পুতুলটার (৫) হাত দুটো কাঁটা (১২) বরাবর ঘুরবে কিন্তু বিষম টানে ও বাইরের দিকের বলের প্রভাবে পা ও দেহটা কাঁটাকে (১৩) কেন্দ্র করে যে দিকে খুশী ছুটে বেড়াবে। চাকা ঘুরে বালি নিচে পড়ে গেলে চাকার একদিক ভারী থাকার দরুন আগের অবস্থায় ফিরে আসবে, ফলে আবার পুতুল হাত-পা ছুঁড়ে ঘুরবে। ১নং বাক্সের নীচের জমা বালি চামচ দিয়ে বার করে নেবে।

হাঁদা-ভোঁদার
বিপন্নের সঙ্কেত
দুর্দান্ত ফিল্ম, নারে, বচা?
ঠিক বলেছো, ভোঁদাদা!
সিনেমায় ঐ বিপদগ্রস্ত নাবিকদের সঙ্কেত পাঠানোর পদ্ধতি দেখে মনে হচ্ছে আমরাও ঐ ধরনের সঙ্কেত দিয়ে বিপদ এড়াতে পারি।
এই যে, ভোঁদা! আয় তোর গোদা গতরে একটু মুষ্টিযুদ্ধের মহড়া দিয়ে নি।
তাই নাকি? আমার সঙ্গীরা থাকতে পারবি না, হাঁদা।
হাঃ হাঃ! কিন্তু তারা তো এখন এখানে নেই!
খুব উঁচা টিপ, ভোঁদা!
আমি তোর দিকে টিপই করি নি, হাঁদা!
দ্যাখ! বিপন্নের সঙ্কেত! ওই দিক থেকে!
শিগগির চল!
এবার তবে শুরু করি?
হেঃ হেঃ! আমরা এবার দলে ভারী এখন তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নে।
থামো, তুমি, হাঁদাদা!
এখন ওদের সামনে থেকে সরে পড়াই ভালো।
তোরা ঠিক সময়ে এসে গেছিস!
হিঃ হিঃ! তোমার সঙ্কেত পাঠাবার মতলবটা দারুণ কাজ দিয়েছে।
আচ্ছা, তাহলে ওরা চোষক তীর দিয়ে বিপন্নের সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।

এবার তাহলে দেখি আমার এই বিপন্নের সঙ্কেতে কারা সাড়া দেয়! হাঃ হাঃ!
লটা বোধহয় বিপদে পড়েছে, ভোঁদাদা!
সংরক্ষিত এলাকা
কার ওপর হামলা হয়েছে?
আমরা তো ভেবেছি ওটা তোর ছোঁড়া তীর!
আমি যেন একটা কিছুর আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি!
মরেছে! এ আবার কি?
কেউ গাছের ওপর লুকিয়ে থেকে আমাদের ফাঁদে ফেলেছে!
ঠিক যা ভেবেছি, এর পেছনে হাঁদা!
দ্যাখ তো, আমার এই তীরটা কেমন লাগে?
অ্যাই!
এঃ!
গরর! আচ্ছা, যারা চোষক তীর ছুঁড়ছে তুই তার একজন!
উল্‌প!
আমার কপালে তীর হাঁকড়ানো? তোকে পাকড়ানোর পর বুঝবি তার ঠ্যালা, মর্কট!
হাঃ হাঃ! বিপন্নের সঙ্কেতই ওকে বিপন্ন করে দিয়েছে!
গেছিরে! বাঁচাও!
আমি কোনরকমে পেনসিল কাটা ছুরিটা বের করে দড়িটা কাটতে পেরেছি!

রজনীকান্ত দাশ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

বিবেক

সুব্রত পন্ডিত

এখন স্কুলের টিফিন। সবুজ মাঠে ছেলেরা কেউ ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত, কেউ কাবাডি, হা-ডু-ডু। বিবেক পলাশের ছায়ায় ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। হরিজনের ঘরের ছেলে বিবেক, তার ওপর জন্ম থেকেই বাঁ পাটা বিকল। ছুটোছুটি করে খেলতে পারে না। তাই আকাশ বাতাস ফুল পাখিই তার অবসরের সংগী। একা একাই কেটে যায় তার সময়।

সেই হৈচৈয়ের মধ্যে হঠাৎ বিবেকের কানে এল তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল আসরাফ তাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে আসরাফ বলল, একা একা কি করছিস। চল্, বাদ্‌শা আর সম্রাট বাগাডুলি এনেছে। একটু খেলি।

শিমুল গাছের একটা বড় ডাল মাটি ছুঁয়ে পড়ে আছে মাঠের একপাশে। ওখানেই সম্রাট আর বাদশা বাগাডুলি খেলছিল। ক্রাচের শব্দে ওরা মাথা তুলে দেখল সামনে বিবেক ও আসরাফ।

আসরাফ বাদশাকে বলল, আমাদের খেলায় নে না! চোখেমুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বাদশা বলল, আমরা কাউকে খেলায় নেব না। প্রায় সংগে সংগে সম্রাট বলল, মা বলে দিয়েছে বাগাডুলি সাবধানে রাখতে আর দেখে শুনে খেলতে। বিবেক– না, ওকে নেব না, তবে তুই খেলতে পারিস। অভিমানে, বেদনায় বিবেকের চোখমুখ কালো হয়ে গেল।

আসরাফ মুখে কিছু না বললেও রাগে গরগর করতে করতে বিবেকের সংগে মাঠের ওপারে চলে গেল। সেখানে সুবিনয়, অর্ণব আর সৌরভ একটা লুডো নিয়ে বসেছে। ওরা আর একজনকে খুঁজছে। কারণ চারজন না হলে লুডো তেমন জমে না। অর্ণব আসরাফকে দেখতে পেয়ে ডাকল। আসরাফ বলল, তোরা বিবেককে নে, আমি খেলব না। অর্ণব বলল, কেন। আসরাফ বলল, ও বেচারা পায়ের জন্য ছুটোছুটি করে খেলতে পারে না। তোরা ওকে নে। আমি বরং আজ জনিদের সংগে ক্রিকেট খেলি।

অর্ণব বলল, সেদিন দাদুর সংগে বেড়াতে গিয়ে হরিজন বস্তি থেকে বিবেককে বেরুতে দেখলাম। দাদুকে বললাম, ঐ খোঁড়া ছেলেটা আমাদের সংগে পড়ে। তাতে দাদু বলল, এইসব ছেলেদের সংগে বেশি মিশবে না। সুবিনয় অর্ণবকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কেন, মিশলে কি হবে? আয় বিবেক খেলবি আয়। অর্ণবের তবু মন গলে না। অগত্যা সুবিনয় চুপ করে যায়। ভাবে তাকেও যদি বাদ দিয়ে দেয়।

ব্যথাহত অভিমানে সহপাঠীদের কাছে অবহেলার পাত্র হয়ে বিবেক আসরাফকে বলে, আসরাফ, ওদের খেলতে দাও। বরং চলো আমরা কোথাও গিয়ে বসি। বিবেকের ব্যথাতুর মুখ দেখে আসরাফের মন খারাপ হয়ে যায়। বিবেককে খুশি করার জন্য সে বলে, আমি কাল থেকে আমার খেলার জিনিস আনব। বিবেক তুই মনের সুখে খেলবি।

টিফিনের পর ওয়ার্ক এডুকেশনের ক্লাস। ছোট ছোট শিল্পীদের হাতের কাজ শেখান নয়ন স্যার। ছেলেরা একে একে মাটির পুতুল, তাসের কুকুর, মোমের খেলনা এনে দেখাচ্ছে। বিবেকের ডাক পড়তেই সে তার আঁকা একটা ছবি এনে দেখাল–সকালবেলার অরণ্যশোভার ছবি। নয়নবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগে পশ্চিমবংগ সরকার আয়োজিত অংকন প্রতিযোগিতায় স্কুল থেকে একমাত্র বিবেককেই প্রতিযোগী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। নয়নবাবু বিবেককে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রতিযোগিতার খবর কি?

বিবেক বলল, এখনও ফল বের হয়নি স্যার।

নয়নবাবু বললেন, তোমার হাত খুব ভাল। আঁকা ছেড়ো না। তোমার হবে।

বাড়ি ফেরার পথেই বৃষ্টি এসে গেল। তাড়াতাড়ি নদীর সাঁকো পার হতে গিয়ে বিবেক আছড়ে পড়ল নদীর জলে।

পরদিন স্কুলের প্রার্থনা সভায় হেড স্যার বললেন, অংকন

প্রতিযোগিতায় ছোটদের বিভাগে বিবেকই প্রথম হয়েছে। তথ্য অফিস থেকে সংবাদ এসেছে বিবেক যদি ভবিষ্যতে আর্ট কলেজে পড়তে চায় তবে সরকার তার ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। হেডস্যার সগর্বে বললেন, বিবেক স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সে আমাদের গর্ব।

হেডস্যার ক্লাস সিক্স-এর লাইনে বিবেককে খুঁজলেন, দেখতে পেলেন না। এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল আসরাফ। বলল, বিবেক কাল স্কুল থেকে ফেরার সময় নদীতে পড়ে গিয়েছিল।

আচমকা এই দুঃসংবাদ শুনে সকলেই নীরব হয়ে গেল। হেডস্যার জিজ্ঞেস করলেন, বিবেক এখন কেমন আছে। আসরাফ বলল, একটু সুস্থ হয়েছে, তবে এখনও খুব একটা ভাল নয়।

লাইন ভেঙে একে একে এগিয়ে এল বাদশা, সম্রাট ও অর্ণব। ওরা প্রথমে আসরাফকে বিবেকের প্রথম হওয়ার শুভ সংবাদ দিল তারপর বলল, আমরা বিবেককে বরাবর খেলা থেকে দূরে রেখেছি। আজ ভীষণ খারাপ লাগছে। সম্রাট বলল, চল বিবেককে দেখে আসি। বাদশাও বলল, সত্যি আমরা এতদিন খুব অন্যায় করেছি। ওঁদের মুখে এইসব কথা শুনে আসরাফ অবাক হয়ে গেল। সে দেখল সকলেরই মুখ বিবেকের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসায় করুণ হয়ে উঠেছে।

হেডস্যার ইতিমধ্যে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে ভুল বুঝতে পেরেছ এটা খুবই ভাল কথা। সব সময় মনে রাখবে, মানুষ মানুষই–তার আলাদা আর কোনো জাত নেই। চল আমিও আজ ছুটির পর বিবেকদের বাড়িতে যাবো।

রজনীকান্ত দাশ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

সবার উপরে মানুষ সত্য

দিবাকর শর্মা

নন্দীপুর গ্রামে এই কয়েকটা দিন সবার মনে একটা আনন্দের জোয়ার আসে। গ্রামবাসীদের বেশির ভাগই গরীব চাষী। এক রকম দিন আনে দিন খায় বললেই চলে। কিন্তু গ্রামের এককালের জমিদার নন্দী বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে তিন চার দিন সবাই দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়।

যখন জমিদারি ছিল তখন যে আসত সবার জন্য পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা করা হতো এই দুদিন। এখন যদিও জমিদারি নেই তবুও নন্দীবাবুরা যতটা সম্ভব জাঁকজমক করেই প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। ওঁদের তিন ভাই বাইরে থাকেন। বড়ভাই বটুকেশ্বর নন্দী থাকেন কলকাতায়–সেখানে তাঁর বিরাট ব্যবসা। মেজভাই অরুণেশ্বর ও ছোট তরুণেশ্বর দুজনেই চাকরি করেন। বংশের পুজোটা মূলতঃ বটুকেশ্বর বাবু করে থাকেন। পুজোর শেষ দিনে কাঙালী ভোজন হয় ও গ্রামের সবাই পাত পেড়ে পেট ভরে খায়। তবে এখনও গ্রামে জাতপাতের ব্যাপার আছে। তাই বামুন, কায়েত, শুদ্দুর এক সঙ্গে বসে খায় না।

সুচাঁদ ডোম, তার বৌ আর ছেলে মানিককে নিয়ে নন্দীবাড়ির গেটের কাছে একটা টিনের ঘরে থাকে। তারাই বাড়ি পাহারা দেয় সারা বছর। মানিকের বয়স বছর দশেক। জগদ্ধাত্রী পুজো এলে সে খুব খুশি হয়। কলকাতা থেকে বাবুরা আসে। কত হৈচৈ হয়।

এবার বড়বাবুর ছেলে দীপুর সঙ্গে মানিকের বেশ ভাব হয়েছে। দীপু তাকে কলকাতার গল্প বলে। মানিক অবাক হয়ে শোনে। তার পর সেও দীপুকে পাখি, শিয়ালছানা, চড়কের মেলার গল্প বলে। দীপুও মজা পায়। দুজনে বাগানে ঘোরে, খেলা করে।

নবমীর দিন সকাল থেকেই দীপুর গা গরম। সে ঘর থেকে মানিককে ডাকল। মানিক কিন্তু ভেতরে যেতে চাইল না। বলল, তারা ডোম–নীচু জাত। তাই বাবুদের ঘরের মধ্যে যাওয়া বারণ। দীপু তবু বুঝতে চায় না। সে বিছানা থেকে উঠে এসে মানিকের হাত ধরে টানাটানি করে। হঠাৎ সেই সময় দীপুর বাবা বটুকেশ্বরবাবু এসে পড়েন। তিনি বিরক্ত হন। দীপুকে ধমক দিয়ে বলেন, আর কোনোদিন যেন এর সঙ্গে মেলামেশা করতে না দেখি। যাও শুয়ে পড়ো। মানিকও ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

দীপু মুখভার করে ভিতরে গেল। তারপর বিছানায় শুয়ে

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা পুজোর কাজ তাড়াতাড়ি সেরে মা এসে দেখেন দীপুর গা যেন আগুন। দীপু জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, মানিক! এস আমরা একসঙ্গে বসে প্রসাদ খাব, বাবা কিছু বলবে না। মা বলেন, দীপু, কি বলছিস বাবা? দীপুর দিদি মণিকা বলে, মানিক সূচাঁদ ডোমের ছেলে। দীপু ওকে ভেতরে ডাকছিল, তাই বাবা খুব বকেছে।

ওদিকে বটুকেশ্বরবাবু পুজোমন্ডপে ব্যস্ত। মণিকা গিয়ে খবর দিল–ভাইয়ের জ্বর খুব বেড়েছে। বটুকেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গেলেন। তিনিও খুব শ্রান্ত। সারাদিন বেশ ধকল গেছে।

কমলাদেবী তাঁকে বললেন, তুমি অসুস্থ ছেলেটাকে বকাবকি করেছিলে? ও কি বোঝে কে ছোটলোক কে ভদ্দরলোক? দেখ কেমন প্রলাপ বকছে। বটুকেশ্বরবাবু বিরক্ত হলেন, আমার ছেলে ডোমের ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করবে সেটা হতে পারে না। তাছাড়া ওর জ্বর হয়েছে কারণ সারাক্ষণ সূচাঁদের ছেলের সঙ্গে রোদে ঘোরাঘুরি করছিল কদিন ধরে।

রাত যত বাড়তে লাগল দীপুর জ্বর ততই বাড়তে লাগল। ওদিকে বটুকেশ্বরবাবুর ধমক খেয়ে মানিকও কিছু না খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক বলেও তাকে কেউ খাওয়াতে পারেনি।

রাত্রে বটুকেশ্বরবাবু স্বপ্ন দেখলেন, মা জগদ্ধাত্রী তাঁর সিংহের পিঠ থেকে নেমে এসে দীপু ও মানিককে কোলে বসিয়ে নিজে হাতে খাওয়াচ্ছেন। আর দীপু ও মানিক মহানন্দে হেসে হেসে কথা বলছে। তারপর তিনি যেন বলছেন–ছোটলোক, ভদ্রলোক, উঁচুজাত, নীচুজাত বলে কিছু নেই। সবাই মানুষ। সবার মধ্যেই আমি আছি। জাত নয় মানুষই সবার উপরে।

তাঁর ঘুমটা ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসে চোখ রগড়ে চারিদিক দেখতে লাগলেন। কই কোথাও তো কিছু নেই। তবে কি স্বপ্ন? তখনই তিনি উঠে দীপুর কাছে গেলেন। কমলাদেবী জেগে বসে আছেন। দীপু মাঝে মাঝে মানিক মানিক বলে ডাকছে। বটুকেশ্বরবাবু একটু ভাবলেন তারপর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সূচাঁদের ঘরের সামনে গিয়ে তাকে ডেকে তুললেন। সূচাঁদ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল। বটুকেশ্বরবাবু বললেন, তোমার ছেলেকে ডাক। সূচাঁদ ভয় পেল। বলল, বাবু সে কি করেছে। বটুকেশ্বরবাবু হেসে বললেন–কিছু করেনি–তুমি ডাক। সূচাঁদ মানিককে নিয়ে এল। তখনও তার ঘুম ছাড়েনি। বটুকেশ্বরবাবু তাকে কাছে ডাকলেন। মানিক ভয়ে জড়সড়। বটুকেশ্বরবাবু বললেন–কোনো ভয় নেই। চল দীপু তোমাকে ডাকছে। তিনি আস্তে তার হাত ধরলেন। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। সূচাঁদ কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল।

কমলাদেবী মানিককে বটুকেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখে একটু অবাক চোখে তাকালেন। বটুকেশ্বরবাবু বললেন, কমলা! মা জগদ্ধাত্রী আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, আর কোনো ভয় নেই। মানিক এসেছে, দীপুর জ্বর কমে যাবে। জাতপাত বলে কিছু নেই। মানিক ডোমের ছেলে, কিন্তু সেও মানুষ। মা স্বপ্নে এই সত্যটাই আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। মানুষই সবার উপরে।

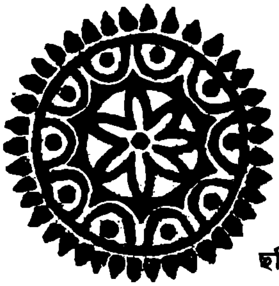

ছবি : দিলীপ দাস

বীরভূম জেলার সিউড়ী সহরপুরা থেকে সুনীতি চট্টোরাজ তাঁর মায়ের স্মৃতিতে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। আমরা শিশিরকুমারী চট্টোরাজের নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

হোলির মজা

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ জ্যৈষ্ঠ। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা দুটি শুকতারার ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার–১০১ টাকা : দ্বিতীয় পুরস্কার–৫১ টাকা

নতুন ধাঁধা

১. তিন অক্ষরে নাম তার, থাকে ঘরে ঘরে।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সাদা রূপ ধরে।।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে কীট রূপ হয়।
আগুনে পোড়াইয়া তার দেহ করি ক্ষয়।।

কৌশিক ও মধুছন্দা দাশ, গিরিডি /বিহার

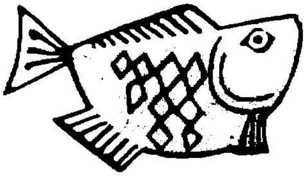

৩. ঝগড়া করি লাঠি মারি,
তবু নাহি যায়।
আগুন দেখালে সে
নিমেষে পালায়।।

সৈকত রায়চৌধুরী
আশুতোষ মুখার্জী রোড /কলকাতা-২৫

২. লম্বা শাদা দেহ তার
মাথায় টিকি রয়,
টিকিতে আগুন দিলে
দেহ তার ক্ষয়।।

ঋত্বিক দে, রবীন্দ্রনগর, কালীতলা /হুগলী

> ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর
> ১. দালাল ২. অন্তরায় ৩. দস্তানা ৪. কপাল

৪. অক্ষর তার তিন, জঙ্গলেতে বাস
শেষের অক্ষর বাদ দিলে ঘটে সর্বনাশ।
মধ্যেরটা বাদ দিলে ঘোরে হস্তাময়
প্রথমটা কেটে নিলে জীব-শ্রেষ্ঠ হয়।।

বৈজয়ন্তী ও অশোক মুখোপাধ্যায়, এইচ.বি.টাউন/সোদপুর

শব্দমালা

১		২	৩	■	৪		৫
	■	৬				■	
৭		■	■	■	৮		
■	■	৯		১০		■	
১১			■		■	১২	■
	■	১৩			■		■
	■		■	১৪			১৫
১৬			■		■	১৭	

সূত্র :

পাশাপাশি

১ অতীতের এক ভারতীয় ফুটবলার ৪ লিখতে লাগে
৬ অতীতের এক চিত্রাভিনেত্রী
৭ যে বাদামের অনেক দাম
৮ বিশেষ ধরনের ছোলা
৯ বাঙলার একটি নদী ১১ দুর্বল নয় আদৌ
১৩ বড়ি-র শুদ্ধরূপ ১৪ জাঁকজমক
১৬ মৃত্যুর পর এটাই অধমের স্থান
১৭ পশ্চিম জার্মানির রাজধানী

ওপর-নিচ

১ একটি রবীন্দ্র কাব্য ২ দশরথ পুত্র
৩ মৌমাছির দান ৪ হিন্দীতে শিল্পী
৫ স্বদেশে বিদেশে ছিল সমাদর তার,
বাঙালী লুপ্ত শিল্প—আজও অহংকার।
৯ শক্তিমানের আছে
পায়ে পায়ে নাচে।
১০ ধোপাকে কাপড় দেওয়া—দেওয়া হলো কি ?
পরিচয় কারকের দ্বিতীয়েতে দেখি।
১১ সাকর মল্লিক তিনি সকলেই জানে,
শ্রীজীব-শ্রীরূপ সাথে রাজে বৃন্দাবনে।
১২ যন্ত্র আর শব্দ দুই-এ আগু-পিছু যায়,
ডাকে পিক-পারাবত কোলাহল প্রায়।

তৈরি করেছেন— শশাঙ্কশেখর মণ্ডল বাবুরবাগ/বর্ধমান

অগ্রহায়ণ সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তর দাতাদের নাম

।। কলিকাতা ।।

লীলা বিশ্বাস/ফাল্গুনী এস্টেট, সল্ট লেক; পার্থপ্রতিম, স্বপন, দেবব্রত ও পঙ্কজ/ইউ.বি.আই হেড অফিস, সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস; অমিতাভ, অরুণাভ, অনন্যা, অনামিকা, রাজা ও টিনা/বৃন্দাবন ঘোষ লেন; সন্দীপ সোম/পশ্চিম বড়িশা গর্ভঃ হাউসিং এস্টেট; জয়দেব, স্বপ্না ও দেবস্মিতা/ভবানীশঙ্কর মহলানবীশ রোড, যাদবপুর; অসীম, অর্ঘ্য, মীনা ও সোমেন পাল/প্রিয়নাথ চক্রবর্তী লেন; অমলেশ মিত্র/বিবেকনগর, সন্তোষপুর; অপর্ণা, আলপনা, সৌমিত্র/রায়পাড়া হাউজিং এস্টেট;

।। হাওড়া ।।

প্রদীপ, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; বাবুন, ফুচি, মাম, বোনা, রাজা, টিঙ্কু ও সান্ত্বনা/সদর বনশ্রী লেন; প্রিয়ব্রত ও প্রীতম/ইছাপুর; মনোহর, অঞ্জন, আশিস, মাধব, দেবব্রত, সুতনু, তাপস ও সজল/হুগলী ডক, সালকিয়া; সাধনা, বিশ্বজিৎ ও দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়/বি. গার্ডেন; বর্ণালী, পিয়ালী, মালবিকা, রাণা ও বাবুই/শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড; আদিত্য, মালতি, আশিস ও বোনা/বাজে-শিবপুর; রমেশচন্দ্র দত্ত ও নির্মলেন্দু ঘোষ/ডোমজুড়, বারুইপাড়া; হীরালাল ও দেবোত্তম ব্যানার্জী/বলুহাটি; প্রদীপ, রঞ্জন, হীরালাল, বৈদ্যনাথ, দিলীপ, জয়দেব/এইচ.আই.টি, হাওড়া ময়দান;

।। ২৪ পরগনা ।।

সৌমেন ও শুভেন্দু নন্দী/রাসবিহারী স্কুল রোড, বারাসাত; সুস্তা, কাকলি ও প্রসাদ/নৈহাটি; সৌমিত্রশঙ্কর ও স্নাতশঙ্কর উকিল/তালবাগান রোড, ব্যারাকপুর; বনানী, কাকলি ও প্রদীপ্ত দেবনাথ/রহড়া; মিনা, সুভাষ, সঞ্জীব ও মালা/মহাজাতিনগর, আগড়পাড়া; সুদেষ্ণা ও সুবর্ণা ঘোষ/ন'পাড়া, কালীবাড়ি রোড, বারাসাত; ঝুম্পু, রন্টু, বুন্টা, রাণা ও টুসি/রাধাগোবিন্দ পল্লী, সোনারপুর; আলতা, অরিন্দম ও দীপঙ্কর/নহাটা;

।। হুগলী ।।

অমিতাভ, মানব, দেবু, সজল, অভি, পার্থ, রাজু/শ্রীরামপুর কলেজ; কণিকা, অপূর্ব, চন্দ্রা, তন্দ্রা, রিক্তা, সজল, শুভ্রা/বিবেকপল্লী, শেওড়াফুলী; ডিকু, মাম্মু/কামারপুকুর রেল কলোনী; রুণা, রাণা, লাল্টু ও বাপি/আরামবাগ, লেকপাড়া; মৃণাল, কুনাল, চয়ন, বুনি ও শচীন/পারমার রোড, ভদ্রকালী; শুভ্রা, স্বাতী, বিমল, অলক, পবন ও সন্দীপ/নবগ্রাম, কোন্নগর; রাজা, বাপী, মীরা ও বিমল/বারাসাত, ব্যানার্জীপাড়া; শিক্ষার্থী ও বিদ্যাবিদ বন্দ্যোপাধ্যায়/বেহুলা; শ্যামাপ্রসাদ, সুপর্ণকান্তি, সঞ্জয়, জীমূতকান্তি, বুনি, বিনীত ও বন্দনা দে/কয়াপাট; শুভ্র, শাশ্বী ও অনুশ্রী গাঙ্গুলী/নিত্যানন্দপুর; শ্রীমতী, দীপা, সীমা বসু/বৈদ্যবাটি রেল গেট, বৈদ্যবাটি; সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়/বৈঁচি, বাঁটিকা; পিনাকী, অপর্ণা, বর্ণালী, অরুণা ও বীণা দত্ত/শান্তিনগর, ভদ্রকালী; মনোমোহন, মীরা, এনাক্ষী, পার্থ ও গৌরী ঘোষ/ময়নাডাঙা, চুঁচুড়ো;

।। মেদিনীপুর ।।

তুষার, পিঙ্কু, রিঙ্কু, কবি, টুকটুকি/বেলদা; বিকলু, চন্দন, মানা, টিনা, জিকু, বুয়া ও মানি/রবীন্দ্রনগর; রুবু, তুতু, লাল্টু, কালু/গোলবাজার, রেলওয়ে কোয়ার্টার; ইন্দ্রনীল, ঐন্দ্রিলা, মায়া, ননীগোপাল ও রথীন/খড়গপুর; ঋতুনির্ঝর, ঋতিরূপা, প্রীতিকণা/আই. আই. টি ক্যাম্পাস, খড়গপুর; শ্রীলেখা, মণিকা, সুস্মিত ও স্বর্ণেন্দু/গড়বেতা; সঙ্কর্ষণ, নীলোৎপল, শর্বাণী/হলুদবাড়ি হাইস্কুল, হলুদবাড়ি; অভীক, বুলু, মনু, রঞ্জন, শুভেন্দু, বাপ্পা, পুতুল, সুমেরু, মনোজ, মলয় ও রাজা/ভোমেশ্বরী বাজার;

।। বর্ধমান ।।

জয়ন্ত, সঞ্চিতা ও সুপর্ণা/ভিড়িঙ্গী, দুর্গাপুর; মনোরঞ্জন, অনিমা, ঝুনঝুন ও ধ্রুব/তরুণ সংঘ, শ্রীরামপুর; মন্টু, বিল্টু, অশোক, টিঙ্কু, টুকাই, বুল্টি, পাপু, পিঙ্কু ও আপ্পু/গুড়েঘর, বিষ্ণুবাটি; শুভ্র, সুমিত, অঙ্কুর ও ছায়া/কুলটি; ব্রততী, সুমন্ত, অচিন্ত্য, সমলু, পাপলু ও রূপী/অন্ডাল, উত্তর বাজার; বি. টি. মুখার্জী, রোজি, রিনি ও মাধুর/বেনাচিতি, দুর্গাপুর; কাজল ও চন্দনা কংসবণিক/চিত্তরঞ্জন; সোনালি, সিদ্ধার্থ, সুদেব, কেয়া, কাকলি, উত্তম ও গৌতম/ভি.কে.নগর, দুর্গাপুর; আবির ও সিঁদুর সেন/শীতলপুর কলিয়ারি, দিসেরগড়; স্বপ্না, পুতুল ও পিয়ালি/সেন্ট্রাল জামবাদ, বহুলা; রঞ্জিত, অজয়, অশোক, উৎপল, প্রশান্ত, প্রদীপ ও সুশান্ত/গুড়েঘর; হীরালাল ও দেবোত্তম ব্যানার্জী/এডিসন রোড, দুর্গাপুর; সুধীর, সোমেন ও রমেন সরকার/শ্রীপুর কলিয়ারি, শ্রীপুর; সুকুমার, নবকুমার, রাজকুমার ও আদিত্যকুমার/ বেলরুই, সীতারামপুর; ধীরা, মীরা, তারা, শিপ্রা, চিত্রা ও কল্পনা দে/গুড়েঘর, বিষ্ণুবাটী;

।। বীরভূম ।।

সেন্টু, বাসন্তী, চৈতালী, শ্রাবণী ও সেবা/সুরারুই; ইকবাল, জুলিয়া, মনসুর ও মুকুট/সিউড়ি; পাপড়ি, শেলি, ইপা, মিঠু ও পারুল/রাতগড়া উঃ বিদ্যালয়, পাথাই; বাবুন ও মাম্পি/রামপুরহাট;

।। বাঁকুড়া ।।

টুটু, টুম্পা, নীলু, দুলু ও রাজু/লোকপুর; পুটুন, মিতু, বিভা, সনৎ ও কালা/গুপ্তনাথ; স্বপন, অর্চনা, অনিন্দিতা/মলিয়ান; অমিয়, প্রতিভা, প্রণব, সাধনা ও বিশ্বজিৎ/গোপালগঞ্জ, বিষ্ণুপুর; অজিত, বর্ণা, সাধনা, জ্যোৎস্না/লক্ষ্মীসাগর; প্রবীর, সুবীর, সুজিত, সুরজিৎ, তরুণ, শুভাশিস, দেবদাসী, সরোজ/পাঁচামী; সরোজ, অমিত, দোলা ও কুচলাকুচুল/ভৈরবপুর, অমরকানন; শান্তনু, শর্মিষ্ঠা, নীলাঞ্জন ও রাজু/লোকপুর;

।। পুরুলিয়া ।।

বাবু, মিমি ও সুপ্রিয়/মুন্সেফডাঙা; মিনু, বাপী, টুকু, মিঠু, টিঙ্কু ও রাজা/আই.টি.আই কোয়ার্টার, রঘুনাথপুর;

।। নদীয়া ।।

অতুল, চন্দ্রা, সুমপা/তমালতলা লেন, নবদ্বীপ; নিশীথ, শিপ্রা ও শিল্পী দে/ষষ্ঠীতলা; পার্থ, তরুণ, প্রশান্ত, কালি, সুষেণ, নারু, আশু ও চঞ্চল/রিডার্স ফোরাম, পালপাড়া, চাকদহ; কুন্তল, সনৎ, সুজিত, সুব্রত, শিখা, লিলি, শম্পা, প্রভা ও সুরেশ/আলাইপুর; রাজা, হিরো, শুভ, ছোট্টু ও অশোক সাহা/বগুলা কলেজ রোড;

।। মেঘালয় ।।

বিপাশা, টুটু ও তোতন বিশ্বাস/মতিনগর, শিলং; তুহিন, কাজল, নিশীথ, নিখিলেশ, রাম, শ্যামল, দেবিকা, প্রীতি, অলোক, সুপ্রিয়া ও জন্মেজয়/লাইমুগরা, শিলং;

।। বিহার ।।

রাজু ও ছন্দা চট্টরাজ/য়ুরোপীয়ান কোয়ার্টার্স, চাইবাসা; সুবোধ, সন্ধ্যা, সুমিত ও স্বরূপ দত্ত/বরটাঁড়, ধানবাদ; আদিত্য, বেলা, মৌমিতা ও সৌরভ দে/থারপাকণা, রাঁচী; অমিত, স্বপ্না, তন্দ্রা, প্রদীপ ও জয় আডিা/টিকিয়াপাড়া; সুদীনকুমার মিত্র, নবজলধর, মায়া, মৌরাণী, সুকুমার, কৃষ্ণা, ছোটন/তেঁতুলতলা রেল কলোনী, ধানবাদ; সুজাতা, শুভ্রা, অশোকেন্দু ও শচীদুলাল/টেলকো, জামশেদপুর; ইন্দ্রাণী ও নন্দিনী চৌধুরী/টেলকো, জামশেদপুর; উমা, তাপস, সোনা, গৌতম, গুড্ডা, বুড়ু, নাড়ু, জয়ন্ত, দোলন, তাতা, অভি ও অন্যান্যরা/গামিতলা, কাটিহার; পুচুন, মনু, ইভা ও ছবি/বিষ্টুপুর, জামশেদপুর, টুনি ও ননী/লোকো কলোনী, গোমো; সুদীপ্তা, দীপান্বিতা, সুব্রত ও বর্ষা সেন/ধানবাদ, নিউ কলোনী; টুম্পা, মৌ, এনা, পিঙ্কু ও নীনা/ধানবাদ।

ফাল্গুন সংখ্যার শব্দমালার উত্তর

(ক)

১. ছাড়াছাড়া ২. অগামারা ৩. কলকাতা ৪. মনগড়া
৫. পরগাছা ৬. গলাকাটা ৭. বাছাবাছা

(খ)

১. ঝালাপালা ২. আরাকান ৩. চালাঘর ৪. কাকপদ
৫. জামানত ৬. চারাগাছ ৭. ডানাকাটা

জিজ্ঞাসার ডাইরি

শিবকৃষ্ণ

১ নিচের প্রশ্নগুলির চারটে করে উত্তর দেওয়া আছে, যদি সঠিক উত্তর থাকে তবে সেটি বার করো, না থাকলে (৫) এ দাগ দাও।

□ সৌরমন্ডলের গ্রহের গতিবিধির প্রথম সঠিক সূত্র দেন —
(১) অ্যারিস্টটল (২) গ্যালিলিও গ্যালিলি
(৩) জোহানস্ কেপলার (৪) টলেমি (৫)

□ যে মহাকাশযানে (কৃত্রিম উপগ্রহ) মানুষ প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে —
(১) ভোস্টক–১ (২) স্পুটনিক ২ (৩) স্পুটনিক ১
(৪) অ্যাপোলো ১১, (৫)

□ প্রথম কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বলেন– "পৃথিবী গোলাকার" —
(১) অতীশ দীপঙ্কর (২) আর্যভট্ট (৩) ভাস্করাচার্য (৪) বরাহমিহির (৫)

□ পৃথিবীর ম্যাপের প্রথম ধারণা দেন–যা পৃথিবীর প্রথম বাস্তব ম্যাপ —
(১) এরাস্থিনিস (২) অ্যালেক্জান্ডার (৩) থেল্স
(৪) অ্যানাক্সিমান্ডার (৫)

□ প্যারাসুটের ধারণা প্রথম দেন —
(১) স্যার আইজাক্ নিউটন (২) অ্যারিস্টটল (৩) ব্লেইস্ পাস্কেল (৪) লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি (৫)

□ টেলিভিশনের পিকচার টিউব প্রথম তৈরী করেন —
(১) জে.এল.বায়ার্ড (২) ভি.কে. জোরিকিন্, (৩) এইলো ক্রিম্যার (৪) ভি.পাওলসন্ (৫)

২ আমরা রোজকার জীবনে এমন সব জিনিস ব্যবহার করি, যার অস্তিত্ব একদিন এই পৃথিবীতে ছিলই না। মহাবৈজ্ঞানিকরা তাঁদের মেধার প্রয়োগে আমাদের এনে দিয়েছেন, টেলিপ্রিন্টার, ব্লেড, রেডিও, ডট্পেন, সিন্থেটিক কাপড় ইত্যাদি। দেখি তাঁদের নাম আর আবিষ্কারের তারিখ মনে করতে পারি কিনা, নীচের ছকে যে তালিকা তিনটি দেওয়া হলো–তার মধ্যে কোন যন্ত্র, কোন বৈজ্ঞানিক, কত সালে আবিষ্কার করেন, তা মেলানোর চেষ্টা করো,—

১ ক্যামেরা	ক।। লুমেরি	অ।। ১৮৩৫
২ রবারের চাকা	খ।। থমাস্ সন্ত্	আ।। ১৮৯৫
৩ নিরাপদ দেশলাই	গ।। ডেভিড পাপিন	ই।। ১৮৮৮
৪ টেপ রেকর্ডার	ঘ।। জন লাউড্	ঈ।। ১৮২৭.
৫ বল পয়েন্ট পেন	ঙ।। ডানলপ	উ।। ১৯৩৮
৬ সেলাই কল	চ।। জন ওয়াকার	ঊ।। ১৬৮১
৭ পিস্তল	ছ।। চেস্টার কার্লসন	ঋ।। ১৮৯৫
৮ প্রেসার কুকার	জ।। স্যামুয়েল কোল্ট	৯।। ১৮৯৮
৯ জেরক্স যন্ত্র	ঝ।। টালবট্	এ।। ১৮৩৫
১0 সিনেমা দেখানোর যন্ত্র।	ঞ।। ভি. পাওলসেন,	ঐ।। ১৭৯0

নমুনা। নমুনা।

যে কথাটা ঘুরছে মনে

দুটো একই মাপের বেলুন–একটা কম আর একটা বেশী ফুলিয়ে যদি একটা পাইপের দুমুখে লাগিয়ে দেওয়া যায় তবে কি হতে পারে?

সাধারণভাবে মনে হবে বায়ুর চাপের বৈষম্যে বড় বেলুনের বাতাস ছোট বেলুনে প্রবেশ করে সাম্যাবস্থা স্থাপন করার চেষ্টা করবে, কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে–ঘটনাটা ঠিক উল্টো ঘটছে। ছোট বেলুনের বাতাস বড় বেলুনে প্রবেশ করছে–এর কারণ কি? —

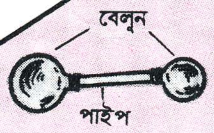

–যেহেতু বেলুন যত বেশী ফুলবে তার মোট স্থিতিস্থাপক বল প্রতি একক ক্ষেত্রফলের জন্যে কমতে থাকবে। ফলে বড় বেলুনের ওপর স্থিতিস্থাপক চাপ (বল প্রতি একক ক্ষেত্রফলে) কম হবে। এই চাপ ভেতরের বাতাসের ওপর ক্রিয়া করে, তাই পাইপ দিয়ে দুটো বেলুনকে সংযোগ করলে ছোট বেলুনের বায়ুর চাপ বড় বেলুনের বায়ুর চাপের থেকে বেশী হওয়ায় ছোট বেলুনের বায়ু বড় বেলুনে প্রবেশ করছে। —

বিজ্ঞানের বিবর্তন

১২২০–১২৯২ (?)–রজার বেকন প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি পরীক্ষাগারে পরীক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দর্শন থেকে আলাদা ভাবে বিজ্ঞানকে একটা শাস্ত্র হিসাবে রূপ দেন তিনিই প্রথম।

একদিন প্রতিদিন

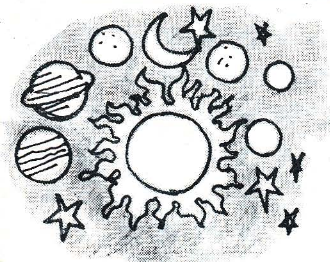

□ মহাবিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা যা জানা গেছে তা হলো মোটামুটি এক লক্ষ (প্রায়)।

□ আবার এক একটা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র। ছায়াপথ এমন এক নক্ষত্রপুঞ্জ যার মধ্যে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ লক্ষ (10×10^{11}), যার একটা হলো আমাদের পরিচিত সূর্য।

□ সূর্যের চারপাশে ঘুরে চলেছে নয়টি গ্রহ, যার তৃতীয়টি হলো আমাদের বাসস্থান–সবুজ স্নিগ্ধ তেরোশো কিলোমিটার ব্যাসের এই পৃথিবী।

□ নয়টি গ্রহের মধ্যে এই গ্রহটির বৈশিষ্ট্য হলো এতে শতকরা ৭0 ভাগ জল আছে আর আছে এক অক্সিজেন ভরা বায়ুমন্ডল–যার ফলে তৈরী হয়েছে প্রায় দু লক্ষ রকমের প্রাণী।

এর মধ্যে সব থেকে উন্নত হলো মানুষ, যার সংখ্যা এখন প্রায় চল্লিশ হাজার লক্ষ।

এই মাসে :

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি (জন্ম ১৫ই এপ্রিল ১৪৫২-ফ্রান্স) 'মোনালিসা' ছবি আঁকা কার তুলিতে'-এর উত্তরে সকলেই যে মহাপুরুষের নাম করে তিনিই হলেন দ্য-ভিঞ্চি। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোনো সীমা ছিল না। তরল পদার্থ, বায়বীয় অবস্থা ইত্যাদি থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, প্রাণীবিদ্যা এমন কি শারীর তত্ত্বের মূল উপাদানও তাঁরই আবিষ্কার। বিজ্ঞানের রেনেসাঁ ঘটে তাঁর হাতেই। তাঁরই ধারণার বাস্তব রূপ, আজকের প্যারাসুট– সাবমেরিন। এই মহামনিষীর মৃত্যু হয় ২রা মে ১৫১৯ সালে।

১ উত্তর —(৩), (১), (৪), (৪), (৪), (২)
২ উত্তর —
১,ঝ,অ; ২,ঙ,খ; ৩,চ,ঈ; ৪,ঞ,৯; ৫,ঘ,ই; ৬,খ, ঐ; ৭,জ,এ; ৮,গ,ঊ; ৯,ছ,আ; ১0,ক,উ।।

১ রোমানদের মাসের প্রথম দিনকে বলা হত ক্যালেন্ডস্ (Calends)–যার থেকে ক্যালেন্ডার কথাটি এসেছে।

হিমগিরি এক্সপ্রেস তিন ঘন্টা লেট। ঘড়িতে বেলা দুটো বাজে। তার মানে আজকের দিনটা জম্মুতেই কাটাতে হবে। কারণ জম্মু থেকে শ্রীনগর দু'শ নব্বই কিলোমিটার পথ। বাসের পক্ষে বারো-তের ঘন্টার কমে এ রাস্তা পাড়ি দেওয়া শক্ত। সাধারণতঃ দুপরের দিকে শ্রীনগরের বাস ছাড়ে না। আর ছাড়লেও লাভ নেই। সেই গাড়ি রাত্তিরে পৌঁছবে এমন আশা ক্ষীণ। কারণ এই সর্পিল পাহাড়ী পথে বেশি রাত্তিরে ড্রাইভিং উচিত নয় বলে সরকারী নির্দেশ আছে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকালেই কাশ্মীরের অবস্হানটা অবশ্য চোখে পড়বে। উত্তর-পশ্চিমে হিমালয় পর্বতমালার কোলে এই অংগরাজ্যটি সুন্দর এক পার্বত্য উপত্যকা। পন্ডিতেরা বলেন, পুরাকালে কাশ্মীর 'সতিসার' নামে এক বিরাট পার্বত্য হ্রদ ছিল। কথিত যে কোনো এক কশ্যপ মুনি এই হ্রদ খনন করেন। তাঁর নামানুসারে হিমালয় পর্বতমালার এই অংশটি 'কশ্যপমার' নামে পরিচিত হয়। এই 'কশ্যপমার' থেকেই কাশ্মীর নামের উৎপত্তি।

পৌরাণিক কাহিনী যাই বলুক, কাশ্মীরে যেতে হলে তার ইতিহাস একটু জেনে রাখা ভালো। রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কল্হনের নাম অনেকেই হয়তো শুনেছ। তাঁর মতে, একদা কাশ্মীর সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেই সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল এখানে। তারপর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হলে হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটে। তের শতকের শেষদিকে কাশ্মীর মুসলিম রাজাদের অধীনে আসে। সেই সময়কার মুসলমান নৃপতিদের মধ্যে জৈনুল আবেদিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই উদারহৃদয় মানুষটি হিন্দুদের জিজিয়া কর দেওয়া রহিত করে দেন। তারপর মুঘল সম্রাট আকবর ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে কাশ্মীর অধিকার করেন। তখন জাহাঙ্গীর এবং তাঁর পত্নী নূরজাহান কাশ্মীর উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে এখানে আসতেন। মুঘলদের পর কাশ্মীর কিছু সময়ের জন্য কাবুলের অধীনে চলে যায়। ১৮১৯ সালে মহারাজা রঞ্জিৎ সিং এই সুন্দর রাজ্যটি দখল করেন। অবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজরা কাশ্মীর অধিকার করে। সেই সময় জম্মুর ডোগরা রাজা গুলাব সিং পঁচাত্তর লক্ষ টাকার বিনিময়ে কোম্পানির কাছ থেকে কাশ্মীর কিনে নেন। অবশেষে ১৯৪৭ সনে কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সেদিনটা জম্মুতে কাটিয়ে পরদিন সকালের বাসেই আমরা শ্রীনগর রওনা হলাম। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পরিবহন বিভাগের (স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন) বাস স্টেশনেই পাওয়া যায়। মোটামুটি তিন রকমের বাস আছে– সুপার ডিলাক্স, এ-ক্লাস এবং বি-ক্লাস। আমরা এ-ক্লাসের টিকিট কেটে বাসে উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটে চলল শ্রীনগরের পথে। আগেই বলেছি জম্মু থেকে শ্রীনগর প্রায় তিনশ' কিলোমিটার রাস্তা। এই সমগ্র পথ কত পাহাড় ডিঙিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে চলে গেছে। আগে জম্মু থেকে শ্রীনগর

যেতে বানিহাল টানেলের মধ্য দিয়ে গাড়ি যেত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ন'হাজার ফুট উঁচে। কিন্তু শীতকালে এত উঁচুতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতো। তাই আর একটু নিচে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে দেড় মাইল দীর্ঘ এক নতুন টানেল তৈরি হয়েছে। এই টানেলের নাম নেহরু টানেল। এটি তৈরি হওয়ার ফলে প্রায় আঠারো মাইল অতি দুর্গম গিরিপথকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথ ভারি মনোরম। পাহাড়ের গায়ে দীর্ঘ, সুদৃশ ফার এবং পাইন গাছের সমারোহ। কোথাও গিরিগাত্র বেয়ে নেমে এসেছে ঝরণা। মাঝে মাঝে ছোট বসতি, সামান্য বড় জনপদ। পথে যেতে যেতে মিলিটারি গাড়ির আনাগোনা চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে ছোট চায়ের দোকান। দুপুরের লাঞ্চ অথবা নৈশাহার সমাপনের হোটেল। এমন কি সাধারণ পান্থনিবাস রয়েছে। রাত দশটা নাগাদ আমাদের বাস শ্রীনগরে ট্যুরিস্ট রিজার্ভেশান সেণ্টারে গিয়ে থামল।

শ্রীনগর রাজ্যের রাজধানী ঝিলাম নদীর তীরে। আয়তনে প্রায় এগারো বর্গমাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। কাশ্মীরে এই শহরটি ট্যুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণ।

শ্রীনগরে পৌঁছবার পরদিন সকালে ট্যুরিস্ট রিজার্ভেশান সেণ্টারে গিয়ে আমরা বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য বাসের আসন বুক করে নিলাম। ভাড়ার অঙ্কটা কম নয়। বরং একটু বেশী। এই বাসে করে একে একে দেখব গুলমার্গ, পহলগাঁও,

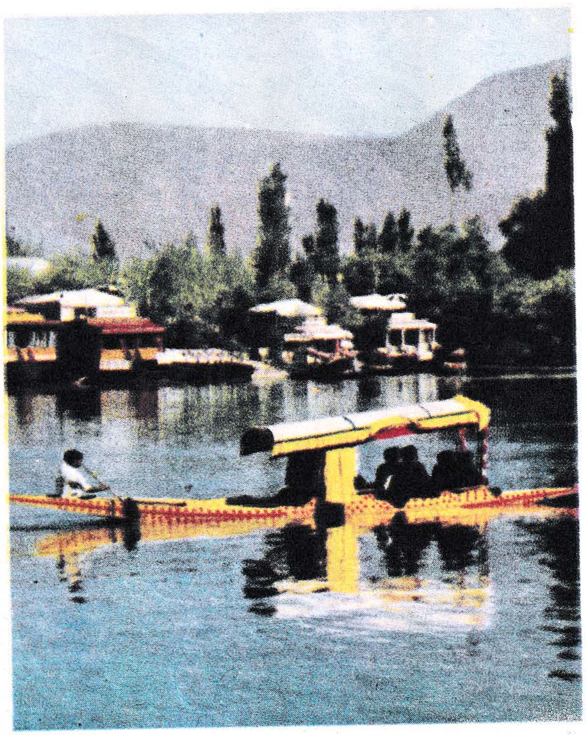

ডাল লেক

সোনামার্গের তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী

সোনামার্গ, উলার হ্রদ, ডাকসুম, কোকেরনাগ ঝরণা ইত্যাদি। এ ছাড়াও শ্রীনগরের আশেপাশে মুঘল বাদশাদের সময়ে তৈরি উদ্যানগুলি না দেখলে কাশ্মীর ভ্রমণ নিশ্চয় বৃথা মনে হবে।

সেদিনই দুপুরে নগরীর নানা মনোরম উদ্যান এবং হজরতবাল মসজিদ দেখতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাস প্রথমেই গেল চশমাসাহীতে। চশমা শব্দের অর্থ ঝরণা। আর সাহী মানে রাজকীয়। যাই হোক, এই রাজকীয় প্রস্রবণের জল নাকি পেটের পক্ষে খুব উপকারী। তারপর গেলাম নিশাতবাগে। নিশাতবাগ কথাটির মানে আনন্দের উপবন বা Garden of Pleasure. নূরজাহান-ভ্রাতা আসফ শাহ এই বিচিত্র উদ্যান তৈরি করিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝরণা এবং নানা বর্ণের পুষ্পের সমারোহে নিশাতবাগ ট্যুরিস্টদের মন কেড়ে নেয়। ডাল লেকের উত্তর-পূর্ব কোণে সম্রাট সাজাহান যে উদ্যান তৈরি করেন, সেটির নাম শালিমারবাগ। সুদৃশ চিনার গাছের সারিবদ্ধ অবস্থান আমাদের মন জয় করে নিল।

পরদিন রওনা হলাম গুলমার্গের উদ্দেশে। কী সুন্দর যে এই পথ। রাস্তার দুপাশে শুভ্র ত্বক পপলার গাছগুলি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। কোথাও দুটি সুদৃশ চিনার বৃক্ষ কৌতূহলী প্রতিবেশীর মতো যেন আলাপচারী করতে পথের উপর ঝুঁকে পড়েছে। আর তাই দিয়ে রচিত হয়েছে এক নয়নাভিরাম খিলান। প্রায় চব্বিশ মাইল গিয়ে আমরা টঙ্গমার্গে চা পান করলাম। এখানে আমরা আমাদের জুতো রেখে পাহাড়ে ওঠার উপযোগী বুট পরে নিয়েছি। গুলমার্গ প্রায় ন-হাজার ফুট উঁচুতে। কী সুন্দর ফুলের শোভা। চারপাশে বড় বড় পাইন এবং ফার গাছ। গুলমার্গে নামতেই ঘোড়া নিয়ে অনেক লোক আমাদের কাছে দৌড়ে এলো। তারা আমাদের খিলানমার্গে নিয়ে যাবে। তাই চললাম ঘোড়ায় চেপে খিলানমার্গের উদ্দেশে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খিলানমার্গ প্রায় ১১000 ফুট উঁচুতে। পাহাড়ী পথ, বনজঙ্গল আর ছোট-বড় শিলার পাশ কাটিয়ে ঘোড়া চলেছে। খিলানমার্গ থেকে এক হাজার ফুট উপরে উঠলে নাকি বরফের দেখা মেলে। আমরা খিলানমার্গ থেকে নেমে এলাম রোপওয়ে বা চেয়ার-লিফটের কাছে।

পরদিন পহলগাঁওয়ের পথে। বাসে যেতে যেতে বাসের কন্ডাক্টর আমাদের জাফরানের ক্ষেত দেখিয়ে দিল। বিস্তীর্ণ জমিতে নীল রঙের অজস্র জাফরানের ফুল। পথে অবন্তীপুরা এবং অনন্তনাগ দেখলাম। অবন্তীপুরায় ইতিহাসের এক অতীত দিনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টির সামনে।

কাশ্মীরে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা বোধহয় পহলগাঁও। এর নামের অর্থ মেষপালকের গ্রাম বা the village of shepherds. পহলগাঁওয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট লিডার নদী। পাহাড়ের গায়ে পাইন, ফার এবং পপলার গাছ। পহলগাঁওয়ে এলে মনে হয় এখানেই থাকি। কী হবে ঘিঞ্জি, ধুলো আর নোংরাভরা মহানগরীতে ফিরে?

শ্রীনগর থেকে পরদিন বেরিয়ে পড়লাম সোনামার্গের উদ্দেশে। এই পথ সোনামার্গ পেরিয়ে চলে গেছে লাডাক এবং লে'র দিকে। বাসে লাডাক যেতে দুদিন সময় লাগে। সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা হলে বিকেলে কারগিল। সেখানে রাত্রিবাস। পরদিন ফের যাত্রা শুরু এবং বিকেলে গাড়ি লাডাক পৌছবে। আমরা অবশ্য লাডাক যাইনি। কিন্তু সোনামার্গে দাঁড়িয়ে তুষারাবৃত লাডাকের পর্বতশ্রেণী দেখেছি। এখানেও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পাহাড়ের বরফ দেখতে অনেকেই যান। স্থানীয় লোকের ধারণা, সোনামার্গের পাহাড়ে স্বর্ণরেণু লুকিয়ে আছে, প্রভাতে সূর্যরশ্মির স্পর্শে তা চিকমিকিয়ে ওঠে।

সেদিন বিকেলে শিকারায় উঠে ডাল লেকে ঘুরছি এদিক ওদিক, একটি ছোট্ট মেয়ে তার ক্ষুদে ডোঙা নৌকোটি বেয়ে আমাদের কাছে এলো। হাতে কটি ফুল। ওর ভাষা একবিন্দু বুঝতে না পারলেও তার ভাবভঙ্গিতে বুঝলাম, যদি একটি দুটি ফুল অন্তত আমরা কিনি তাহলেই সে খুশি হবে। একটি নয়, সব কটি ফুল ওর কাছে থেকে কিনে নিলাম। ছোট্ট মেয়েটি হাসল, ফুলের চেয়েও মিষ্টি সে-হাসি।

ছবির মজা

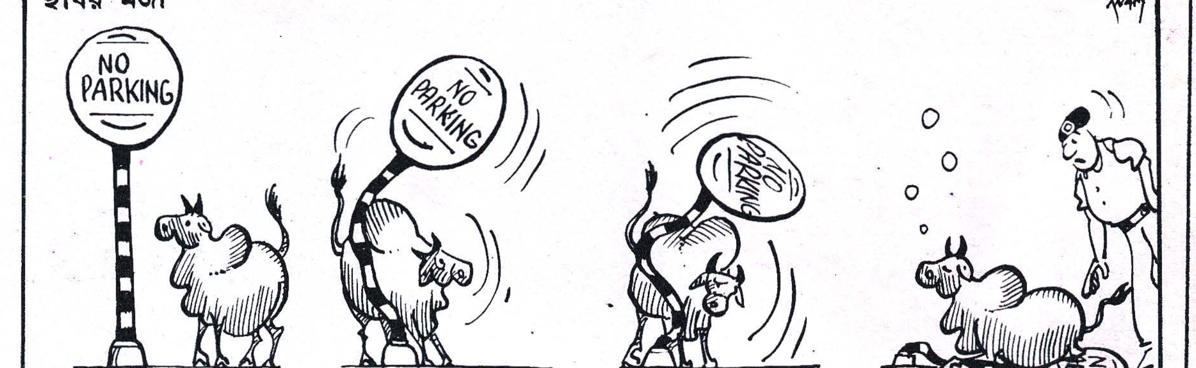

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

দেখো কেমন দেখতে দেখতে বছরটা শেষ হয়ে এলো। ১৩৯৪ সালকে সাদরে আহ্বান জানাতে আমরাও তৈরি। নববর্ষ সংখ্যা শুকতারা হাতে পেলে চমকে উঠবে। দুটো সম্পূর্ণ উপন্যাস, অনেক গল্প আর নানারকম ফিচারে ভরা এই সংখ্যাটি ঠিক তোমাদের মনের মতো হয়ে উঠবে। হাতে পেলে আর ছাড়তেই চাইবে না।

চারদিকে চোখ বুলোলে আমরা এখন কি দেখি? প্রথমেই চোখ পড়ে গাজনের সন্ন্যাসীদের ওপর। গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরে হাতে ত্রিশূল নিয়ে সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়ান। হাঁক দেন—বাবা বিশ্বনাথের চরণে সেবা লাগি মহাদেব, জয় বাবা তারক বাবা....আরও কতো কী! কলকাতা শহরে অবশ্য এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। কিন্তু শহর ছাড়লেই কানে আসবে গাজনের সন্ন্যাসীদের চিৎকার।

ওদিকে গরম বাড়ছে। রাস্তায় ধুলো উড়ছে, গলতে শুরু করছে রাস্তার পিচ। বাতাসে ভেসে বেড়ায় লেবু ফুলের মিষ্টি গন্ধ। এক একদিন বিকেলের দিকে মেঘ করে আসে। হাওয়া ওঠে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টিও হয়। আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে ছায়াপথ উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে নেমে গেছে। অনেক নিচে। পুব কোণে দেখা যাচ্ছে স্বাতী নক্ষত্রকে। পুব আকাশে দেখা দিয়েছে কন্যা রাশি। এই কন্যা রাশির চিত্রা নক্ষত্রের নাম থেকেই এই মাসের নাম চৈত্র।

তবে এ মাসের সব চেয়ে বড় ব্যাপার কী বলো দেখি! আগেও কিন্তু বলেছি। ভুলে গেছো তো? আচ্ছা, আবার বলছি। চৈত্র মাসের অর্ধেকটা মার্চ মাসে। এই মার্চ মাসের ২১ তারিখেই মহাবিষুব হয়। সেইদিন সূর্য বিষুবরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। তাই সারা পৃথিবীতেই ঐ দিনটিতে দিন এবং রাত সমান সমান। শীতকালে তো রাতটা অনেক বড় ছিলো। দিনটা, বিশেষ করে বিকেলটা যেন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতো। শীত ফুরিয়ে আসে, রাতও ছোট হয়। ২১ মার্চ দিন আর রাত সমান সমান। এরপর থেকে দিনটা বড় হতে আরম্ভ করে। আর রাতটা ছোট। সূর্যদেবও চটপট উঠে পড়েন, অস্তও যান দেরি করে। ২১ মার্চ তো ক'দিন আগেই চলে গেছে। দিনটা এখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছো কী! নিশ্চয়ই পারছো। বিকেলে খেলার সময়টা যে বেড়ে যাচ্ছে।

এসো এবার একটা গল্প শোনা যাক। স্বভাব যায় না ম'লে কথাটা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। বলো দেখি কোথা থেকে এলো এই প্রবাদটা? সেই গল্পটাই বলি! অনেক অনেকদিন আগের কথা। পলাংকায়ন নামে একজন মুনি ছিলেন। আশ্রমে মুনি আর তাঁর স্ত্রী থাকতেন। আর থাকতেন তাঁদের অনেক শিষ্য। মুনির কোনো ছেলে-মেয়ে ছিলো না। তার জন্যে অবশ্য তাঁদের কোনো দুঃখও ছিলো না। মুনি একদিন গঙ্গায় স্নান করে ফিরছেন এমন সময় এক বাজপাখির মুখ থেকে একটা ইঁদুর ছানা মাটিতে পড়ে ছুটতে ছুটতে এসে পলাংকায়নের দুপায়ের মধ্যে আশ্রয় নিলো। ভয়ে কাঁপছিলো ইঁদুরটা। তাই দেখে মুনির খুব দয়া হলো। তিনি পাথর ছুঁড়ে বাজপাখিটিকে তাড়িয়ে দিলেন। হাতে তুলে নিলেন ইঁদুরটিকে। ইঁদুর বললো, প্রভু, আপনি আমায় বাড়ি নিয়ে চলুন। না হলে ঐ বাজপাখি আমায় শেষ করে দেবে।

মুনি ভাবলেন, সত্যিই তো—ইঁদুরটিকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আবার হাতে একটা ইঁদুর নিয়ে আশ্রমে ফিরলে সকলে হাসাহাসি করবে। তাই মুনি পলাংকায়ন ইঁদুরটিকে একটি বাচ্চা মেয়ে বানিয়ে নিয়ে গেলেন আশ্রমে। মুনির বউ তো ভীষণ খুশি মেয়ে পেয়ে। তাঁর আদর যত্নে মেয়েটি বড় হতে লাগলো। দেখতে দেখতে মেয়ে বেশ বড় হয়ে গেলো। এবার তো মেয়ের বিয়ে দিতে হয়। মুনিপত্নী সে কথা বললেন মুনিকে। মুনি বললেন, আমার মেয়ের জন্যে সেরা বর চাই। তা যদি ওর পছন্দ হয় তাহলে ভগবান সূর্যকে ডেকে এনে ওর বিয়ে দিই তাঁর সঙ্গে। মুনিপত্নী এককথায় রাজী।

মুনি তখন সূর্যদেবকে আহ্বান করলেন। সূর্যদেব এলে মুনি তাঁর মেয়েকে ডেকে এনে বললেন, এই দেবতা তিনভুবন আলো করে আছেন। তোমার কি এঁকে পছন্দ হয়?

মেয়ে মাথা নাড়লো। বললো, না বাবা সূর্যদেব বড় জ্বালান-পোড়ান—আপনি এঁর চেয়েও বড় কাউকে ডাকুন।

সূর্যদেব বললেন, মেঘের শক্তি আমার চেয়েও বেশি। ও আমায় ঢেকে ফেললে আমার আর কিছুই করার থাকে না। আপনি বরং মেঘকেই ডাকুন।

মুনির আহ্বানে মেঘ এলেন। মুনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখো সূর্যদেব বলে গেছেন মেঘ তাঁর চেয়েও বড়—তোমার কি এঁকে পছন্দ হয়?

মেয়ে মাথা নাড়লো। বললো, ইনি বড় কালো। এঁকে আমার পছন্দ নয়—আপনি এঁর চেয়ে বড় কাউকে ডাকুন।

মুনি তখন মেঘকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চেয়ে বড় কেউ আছেন নাকি?

মেঘ বললেন, নিশ্চয়ই আছেন। হাওয়া আমার চেয়ে বড়। যখন খুশি আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি বরং হাওয়াকেই ডাকুন।

মুনির আহ্বানে এলেন পবনদেব। কিন্তু তাঁকে দেখে মেয়ে আবার ঘাড় নাড়লো। বললো, ইনি বড়ই চঞ্চল। আমার পছন্দ নয়। আপনি ওঁর চেয়েও বড় কাউকে ডাকুন।

পবনদেব তাই শুনে বললেন, আমার চেয়ে বড় হলো পাহাড়। আমার যতো শক্তিই থাকুক না কেন—পাহাড়ের সামনে গিয়ে আমায় থেমে যেতে হয়। আপনি পাহাড়কেই ডাকুন।

মুনির ডাকে এলেন পাহাড়। পাহাড়কে দেখে মেয়ে বললো, ইনি খুবই শক্তিশালী ঠিকই। কিন্তু বড় নিরেট। তাছাড়া নড়াচড়া করতে পারেন না। এঁকে আমার পছন্দ নয়। আপনি এঁর চেয়েও শক্তিশালী কাউকে ডাকুন।

মুনি পাহাড়কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চেয়েও শক্তিশালী কেউ আছেন নাকি? পাহাড় বলেন, আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ইঁদুরের। তারা আমার নিরেট শরীরেও গর্ত করে ফেলে। আপনি বরং ইঁদুরকে ডাকুন।

মুনির ডাকে এলো ইঁদুর। ইঁদুর দেখে মেয়ের আনন্দ আর ধরে না। সে স্বজাতি হিসেবে চিনতে পারলো। বললো, বাবা আপনি আমাকে ইঁদুর করে দিয়ে এঁর হাতেই সম্প্রদান করুন।

মুনি তাই করলেন। আর বুঝলেন, স্বভাব যায় না মলে।

কী কেমন লাগলো!

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ্।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

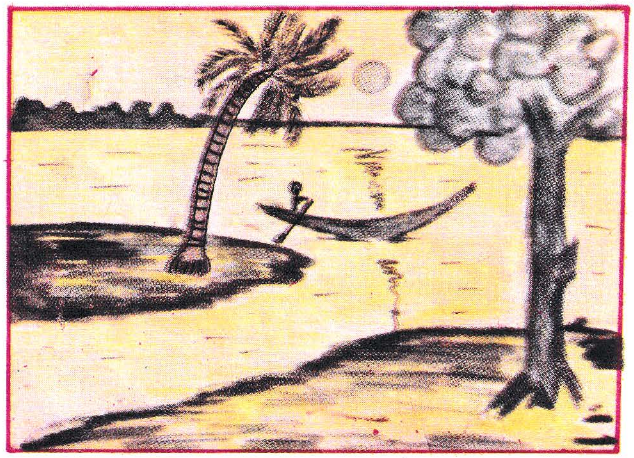

অঞ্জন মন্ডল বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী সেন্ট জোসেফ স্কুল ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ

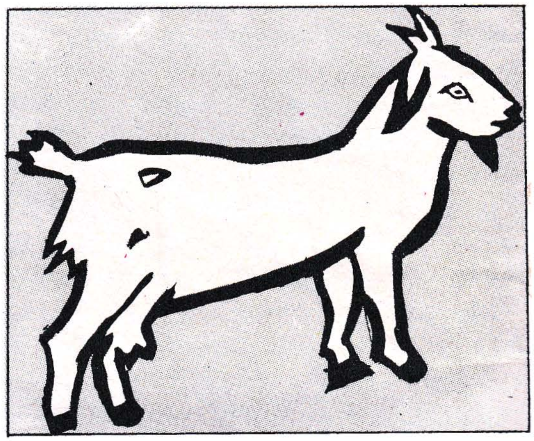

সুগত সেনশর্মা বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী হাওড়া

রোদের আগুন

গাছের পাতা পড়লো ঝরে
আসলো বুঝি ফাগুন,
সবুজ পাতায় নৃত্য রোদের
ঝিলিক ঝিলিক আগুন।

রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়া
আরো পলাশ ফুল
আনন্দেতে উঠলো মেতে
মৌপিয়াদের কুল

মল্লিকাদল মনটা ভরায়
গন্ধ বিলায় শুধু
আবীর রঙে হোলি খেলা
দূরের আকাশ ধূ-ধূ।

শ্রীদামকুমার সরকার
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী বগুলা হাইস্কুল, নদীয়া

নবারুণ কুমার নাগ
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী ডাঙ্গাপাড়া, কাঁচরাপাড়া চব্বিশ পরগণা

Response 1011

রবির বার রবিবার

আরতি বসু

ইংরাজী মাসের নামগুলোর মতো সপ্তাহের নামগুলোও কি এসেছে গ্রীক আর রোমান দেবদেবীর নাম থেকে? ছুটির দিনের দুপুরে হঠাৎই টুনুর প্রশ্ন।

তোমার কি মনে হয়? টুনুকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

টুনু বলল, প্রথম দুটো দিনের নাম যে সূর্য আর চাঁদ থেকে এসেছে সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু বাকি পাঁচ দিন?

বললাম, বাকি পাঁচদিনের নাম এসেছে উত্তর ইউরোপের দেশগুলির পৌরাণিক দেবদেবীর নাম থেকে। এদের মধ্যে অ্যাংলো-স্যাক্সন, টিউটোনিক এবং জার্মান উপকথার দেবদেবীরা রয়ে গেছেন আজও। আর চন্দ্র-সূর্য তো পৃথিবীর সব দেশেই পূজো পেয়ে এসেছেন সভ্যতার আলো ফোটার প্রথম মুহূর্তটি থেকে। সূর্য যেমন সুমেরীয়দের কাছে শামাশ, মিশরে রা, ফোনেশিয়ায় এল, গ্রীসে হেলিওস (পরে অ্যাপোলো) ইত্যাদি। তাঁকে নিয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে কত গল্প-উপকথা।

গল্পের নাম শুনেই টুনু খুশি। বলল, বলনা সেই গল্প।

আমি বললাম, আজকের মতো বিজ্ঞান না জানলেও সভ্যতার আদিযুগেই মানুষ বুঝেছিল জীবনের মূল উৎস সূর্য। মিশরীয়দের কথাই ধর প্রথমে। তাদের কাছে সূর্য ছিলেন সৃষ্টিকর্তা। তখন কোথাও আলো নেই, মাটি নেই, প্রাণ নেই। আছে শুধু অতল অন্ধকার মহাসমুদ্র। এই মহাসমুদ্রের বুকেই রা-এর আবির্ভাব। প্রথমে তিনি চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়েছিলেন পদ্মফুলের কুঁড়ির ভেতর। তখন তাঁর নাম ছিল আতুম। তারপর একসময় চোখ ধাঁধানো ঝলমলে চেহারা নিয়ে দেখা দিলেন। নাম হলো রা। রা-এর চোখের জল থেকে জন্ম নিল মানুষ এবং যাবতীয় প্রাণী। আটজন সংগীকে নিয়ে রা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব শুরু করলেন তার সৃষ্ট প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে। হেলিওপোলিস তাঁর রাজধানী। প্রতিদিন সকালে স্নান খাওয়া সেরে তিনি তাঁর নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। রাজ্যের বারোটি এলাকা ঘুরে দেখতেন এক এক ঘন্টা ধরে। এইভাবে সুখে শান্তিতে কেটে গেল অনেকগুলো দিন।

রা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর শরীর কাঁপে। আগের মতো অত জোর নেই। এই সুযোগে তাঁরই এক সংগী আইসিস দল পাকালেন। সবাইকে বোঝালেন, রা-কে এবার বাতিল কর। বেচারা বুড়ো হয়েছে। অতসব রাজ্যপাট ও কি আর সামলাতে পারবে? তার বদলে আমাকেই রাজা কর।

মানুষও এত বোকা যে আইসিসের কথা শুনে নেচে উঠল। শেষ পর্যন্ত সেই কথা গেল রা-এর কানে। রা-তো চটে লাল। মানুষ এত অকৃতজ্ঞ! তিনি সব দেবতাদের ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ করলেন। ঠিক হলো অবাধ্য প্রজাদের ওপর তিনি তাঁর কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। তাই হলো। শাস্তি পেল বিশ্বাসঘাতকরা।

তবে কিছুদিনের মধ্যে রা শান্ত হলেন। নয়তো সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ক্ষমা তো করলেন কিন্তু মানুষের ওপর অভিমান করে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন তিনি। উঠে গেলে আকাশের ওপারে। সেখান থেকেই সৃষ্টি হলো বর্তমান বিশ্বের।

এরপর থেকে খুব সাবধানে হিসেব করে চলেন রা। দিনের বারোটা ঘন্টা ধরে তাঁর নৌকো চলে পুব থেকে পশ্চিমে। মাঝে মাঝে জলদানব আপেপ-এর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। পাতাল থেকে উঠে এসে আপেপ চেষ্টা করে তাঁকে খেয়ে ফেলতে। তাই মাঝে মাঝে সূর্যের গায়ে ছায়া পড়ে, গ্রহণ হয়। কিন্তু আপেপ শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। কোনো অন্যায় রা সহ্য করেন না। তাঁর জ্যোতি সত্য, ন্যায় এবং শক্তির প্রতীক।

মিশরের রাজা ফারাওরা মনে করতেন যে তাঁরা সকলেই রা-এর পুত্র। এইজন্য পিরামিডের প্রবেশ পথের সামনেই রা-এর মহিমা খোদাই করা হতো। এমন কি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য স্ফিংস কে অনেকে মনে করেন উদীয়মান সূর্যের প্রতীক বলে।

এই সূর্য বা সান থেকেই এসেছে সানডে বা রবির বার– রবিবার।

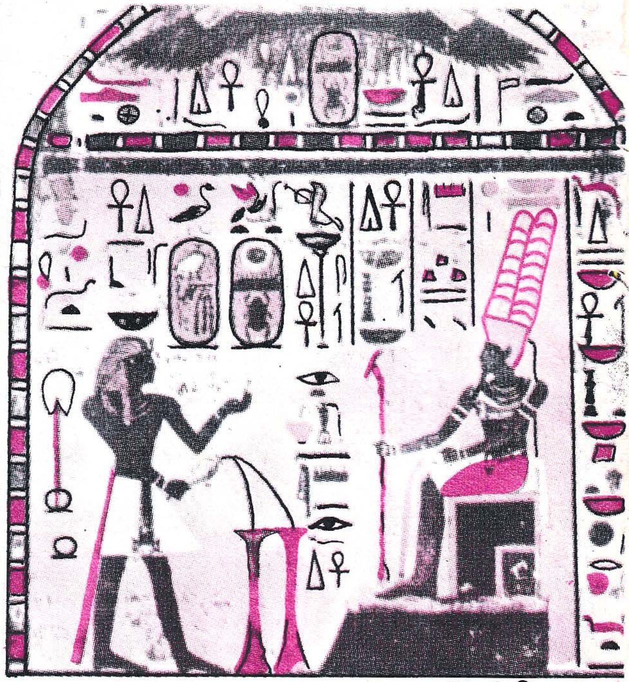

ছবি: দিলীপ দাস

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেংগল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

ছবি দেখতে ছোটরা ভালোবাসে। রংচংয়ে ছবি হলে তো কথাই নেই। সেই দিকে নজর রেখে

দেব সাহিত্য কুটীর

একের পর এক বের করে চলেছেন অফসেটে ছাপা রংবেরংয়ের ছবিতে ভরা সব বই। ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ আরও অনেক কিছু।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বর্ণপরিচয়

(প্রথম ভাগ)

অফসেটে ছাপা বড় আকারের নতুন বই। আগাগোড়া চার রংয়ে ছাপা অজস্র ছবিতে ভরা বর্ণপরিচয়ের নবতম সংস্করণ।

খুশির পড়া দাম : ৬.০০ মাত্র

খুশি হয়ে পড়ার মতো বই-ই বটে। পাতায় পাতায় রংয়ের বাহার, ঝকঝকে সব ছবি ছোটদের তাক লাগিয়ে দেবে।

গুণতে মজা দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবি আর ছড়া দিয়ে ছোটদের যেমন গুণতে শেখানো হয়েছে তেমনি শেখানো হয়েছে যোগ, বিয়োগ করতেও। ছবি দেখে ছড়া পড়তে পড়তেই ছোটরা শিখে যাবে অংকের প্রথম পাঠ

খোকাখুকুর ABC দাম : ২.৫০ মাত্র

বাংলার সাহায্যে ইংরাজি শেখানোর বই আর বোধহয় নেই। রংচংয়ে ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে ইংরাজি অক্ষরমালা।

আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয় দাম : ৬.০০ মাত্র

ছোটদের বর্ণপরিচয়ের এক মজাদার বই। একটি বইয়েই বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি আর উর্দু বর্ণমালা শেখার সুযোগ রয়েছে।

ছবিতে ভারতের ইতিহাস

দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র

দেশের কথা জেনে ছোটরা যাতে বড় হতে পারে সেইজন্যেই চার রংয়ে ছেপে নাম মাত্র দামে বার করা হয়েছে এই বইটি।

ছোটদের চিড়িয়াখানা	আগডুম বাগডুম	ইকড়ি মিকড়ি
দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবিতে ভরা ছোটদের ভালো লাগার মতো দারুণ তিনটি ছড়ার বই। হাতে পেলে ছোটরা এর একটিও ছাড়তে চাইবে না।

দেব সাহিত্য কুটীর ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

Registration No. W.B./E.C.—61 March '87 "Suktara"

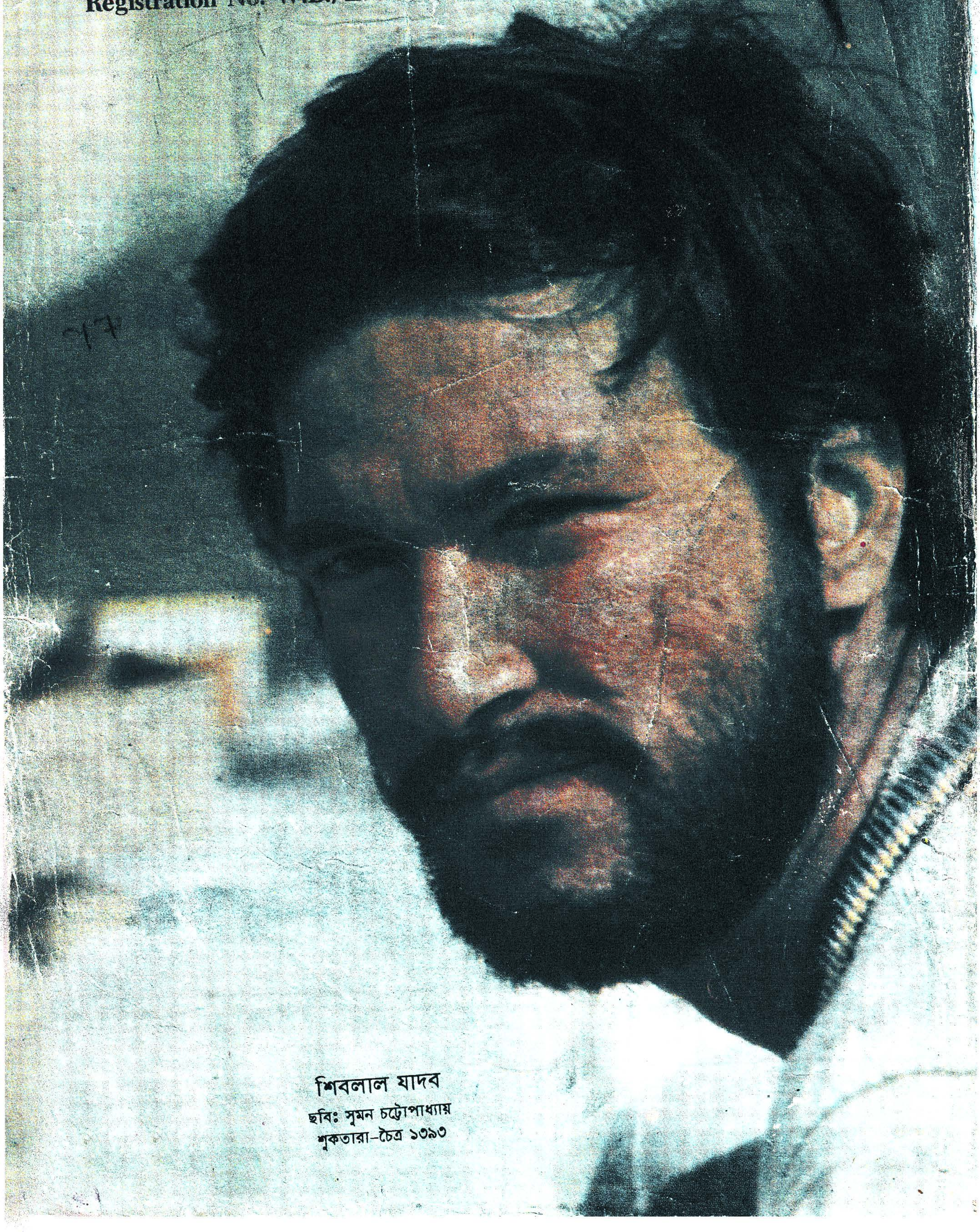

শিবলাল যাদব

ছবিঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়

শুকতারা-চৈত্র ১৩৯৩